বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে প্রকাশিত
Published on the occasion of the World Environment Day 2024

উপদেষ্টা
ড. আবদুল হামিদ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান

সম্পাদক
সৈয়দা মাছুমা খানম
মির্জা শওকত আলী
মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
ফরিদ আহমদ
মোঃ সামছুজ্জামান সরকার
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
খন্দকার মাহমুদ পাশা
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
মিস ইয়াসমিন আক্তার
শোয়াইব মোহাম্মদ শোয়েব

প্রকাশকাল
৫ জুন, ২০২৪

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত
Published by the Director General, Department of Environment
পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ০২-২২২২১৮৫০০, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, ফেসবুক: facebook.com/doebd

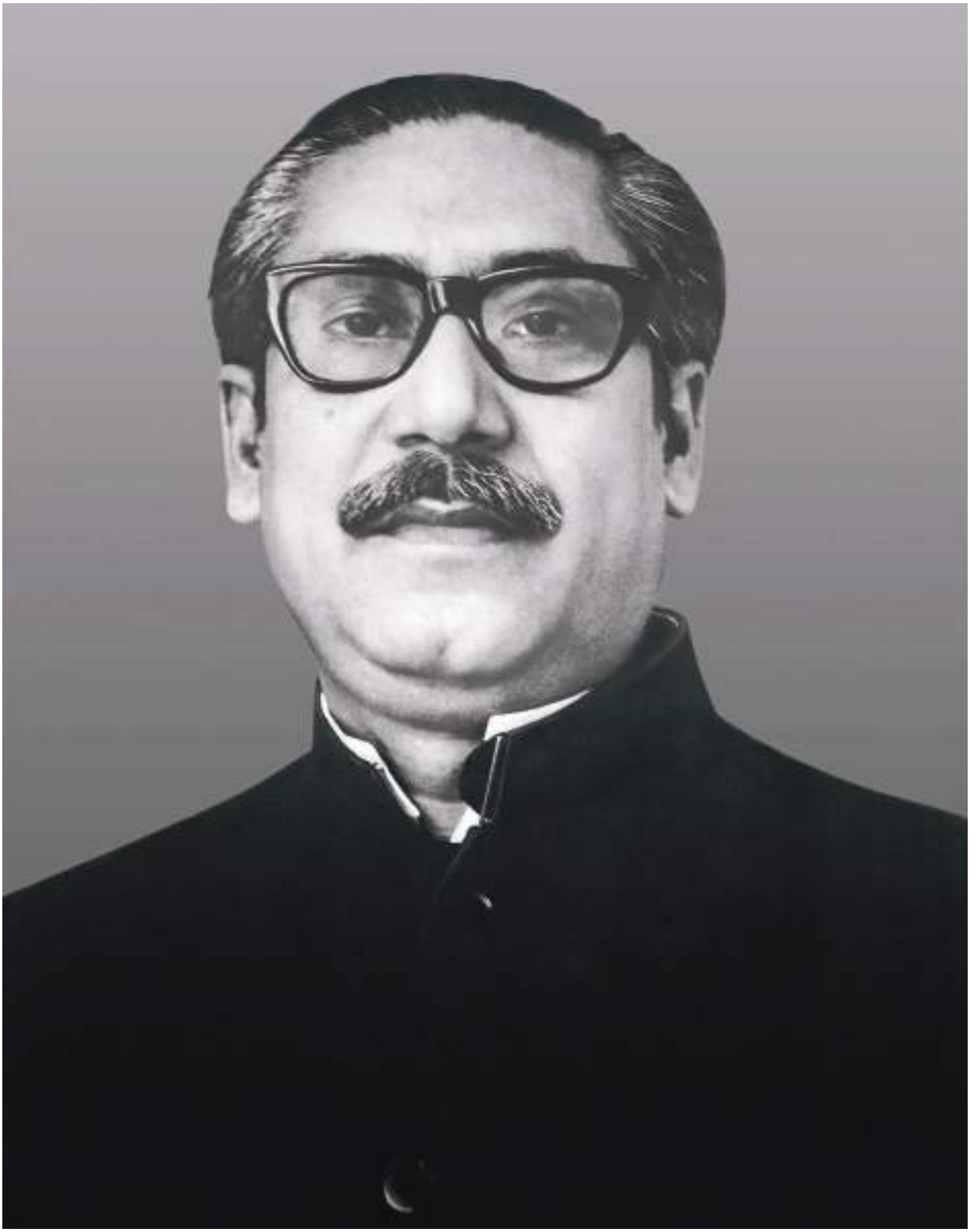

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানব সম্প্রদায় ও প্রাণিকূলের অস্তিত্বের জন্য দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের বিকল্প নেই। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপায়ে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করছি। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশের ভূমিসম্পদ অত্যন্ত সীমিত। খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের কারণে ভূমির অবক্ষয় ঘটছে। ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তার বিরুদ্ধে লড়াই এবং খরা সহনশীলতা বৃদ্ধি করা আমাদের অস্তিত্বের জন্য জরুরি। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ভূমির টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিতে ভূমি প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রেক্ষিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'Land restoration, desertification and drought resilience' যার ভাবার্থ 'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা' তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তা রোধ এবং খরা সহিষ্ণুতা অর্জনে ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে একীভূত করে উদ্ভাবনী ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও, অবক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি পুনরুদ্ধারে বৃক্ষরোপণসহ টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে জীববৈচিত্র্য যেমন সুরক্ষিত হবে, তেমনি এর মাধ্যমে জনগণের নিরাপদ জীবিকা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত- সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাহলেই আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হবে।

'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪' উদযাপন সফল হোক- এ কামনা করি।।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও অদূরদর্শী কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয় রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দিবসটির পালন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে ।

পৃথিবীতে এখন আটশত কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করছে। সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে ভূমির ব্যবহার। ভূমি সম্পদের অপরিমিত ও অপরিণামদর্শী ব্যবহারের ফলে বিশ্ব জুড়ে ভূমির অবক্ষয় তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) বিশ্বব্যাপী টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে Land Degradation Neutrality (LDN) অর্জনের রূপরেখা প্রদান করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কাঙ্খিত ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা বা LDN অর্জন করা সম্ভব না হলে ২০৪৫ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ১৩৫ মিলিয়ন মানুষ খরার কারণে উদ্বাস্তু হতে পারে । অপরদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর অভিঘাত আমাদের জন্য চরম বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী মরুময়তা ও খরার প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, যার কারণে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কাজেই, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Land restoration, desertification and drought resilience' অর্থাৎ 'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বময় ভূমির অবক্ষয় রোধ, মরুকরণ ও খরার প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে আমরা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছি। UNCCD-তে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে এ সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন রিপোর্ট দাখিল করে যাচ্ছে। আমরা জাতীয় পর্যায়ে 'Bangladesh National Action Program (NAP) to Combat Desertification, Land Degradation and Drought 2015-2024' প্রণয়ন করেছি। জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ প্রণয়ন এবং এটি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সাথে আমরা UNCCD এবং NAP এর সাথে সমন্বয় করে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ২০৩০ সালের মধ্যে ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা (LDN) অর্জনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

সমন্বিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলার অংশ হিসেবে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে National Adaptation Plan 2023-50, Updated Nationally Determined Contribution (NDC) 2021 এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan 2022-41' গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে প্রথমবারের মত UNFCCC এর সহায়তায় বিশ্বের ১০৪টি দেশের অংশগ্রহণে NAP EXPO BANGLADESH 2024 সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ভূমি অভিযোজন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা আমার দশটি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মরুকরণ ও খরার প্রবণতা হ্রাসে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

শেখ হাসিনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

সারা বিশ্বে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো: Land restoration, desertification and drought resilience - যার বাংলা ভাবানুবাদ হচ্ছে: "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" এবং স্লোগান- "#GenerationRestoration"- অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত হয়েছে মর্মে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে জলবায়ু নিয়ে বাংলাদেশের আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিশ্বের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'গ্রহজনিত জরুরি অবস্থা' (Planetary Emergency) ঘোষণা করা হয়েছে।

পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ এবং এখানেই সকল প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদের শতকরা ৮৫ ভাগের বসবাস। মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত ও অপরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে ভূমির ক্রমাগত অবক্ষয় ঘটছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব। বিভিন্ন মাত্রার এই অবক্ষয় পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ ভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে, যা পৃথিবীর ৩২০ কোটিরও বেশি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা, জীববৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম পরিষেবার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সৃষ্টিকারী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশেও ভূমির ক্রমাগত অবনমন ঘটেছে। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০২০ সালে মধ্যম থেকে তীব্র অবক্ষয়িত ভূমির পরিমাণ ১১.৪৫ মিলিয়ন হেক্টর, যা ২০০০ সালে ছিল ১০.৭০ মিলিয়ন হেক্টর। মূলত অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য কাজে বনভূমি, পাহাড় ও বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, কৃষিকাজে অতিকর্ষণ এবং অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার বিস্তার, উত্তরাঞ্চলে খরার প্রবণতা, নদীর তীর ভাঙন, ইত্যাদি কারণে ভূমির অবক্ষয় ঘটছে।

সদস্য দেশ হিসাবে বাংলাদেশ UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)-এর আওতায় ২০৩০ এর মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য Land Degradation Neutrality (LDN) Voluntary Target প্রণয়ন করে দাখিল করেছে। এই টার্গেটের আওতায় অবক্ষয়িত ২০০০ বর্গ কিলোমিটার কৃষিজমির মাটির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমির শ্রেণি পরিবর্তন রোধ করা, ৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস করা, ৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার পাহাড়ের ভূমি ক্ষয় হ্রাস করা, ১২০০ বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকায় লবণ পানি প্রবেশ রোধ করা ও প্রতিবছর ১০০ হেক্টর নদীর তীর ভাঙন রোধ করার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ১৩টি প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে (ইকোসিস্টেম) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসাবে বিশেষ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, পাহাড় কাটা, জলাধার ভরাট, যত্রতত্র শিল্পকারখানা ও ইটভাটা স্থাপন, বনভূমি দখল, নদীর তীর দখল, ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমির অবক্ষয়রোধ ও খরা সহিষ্ণুতা অর্জনে আমাদের মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য সরকারি সংস্থা জড়িত এবং এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে Whole of Government এবং Whole of Society Approach-এর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ও ভূমির অবক্ষয় রোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় পর্যায়ে সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি)

সভাপতি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

মানুষসহ সকল প্রাণীর একমাত্র আবাসস্থল পৃথিবী নামক এই গ্রহটির প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং তার ভারসাম্য সুনিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশেও আজ "বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪" উদযাপিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের স্মরণে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Land restoration, resertification and drouhgt Resilience' যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা'। এছাড়া এ বছরের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে Generation Restoration। সারা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা আজ ভূমির অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতির সম্মুখীন। গ্রামীন জনগণ, প্রান্তিক চাষী এবং অতি দরিদ্র জনগণ এর ফলে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ের অতিব জরুরি এ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে অবক্ষয়িত ভূমি পূনরুদ্ধারের বিষয়ে আমারদেরকে কার্যকর এবং সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যা এ বছরের প্রতিপাদ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কেবলমাত্র নগররাষ্ট্র ব্যতীত সারা বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। এ সামান্য পরিমাণ জমিতেই আমরা গড়ে তুলি আমাদের আবাসস্থল এবং এ জমিতেই আমরা ফসল উৎপাদন করে জীবনধারণ করি। এ কারণে সারা দেশের জমির ওপর চাপ বাড়ছে। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল চাষ করা হচ্ছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পকারখানার দূষণ এবং অতি ব্যবহারের ফলে মাটির অবক্ষয় একটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে মাটির স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। অন্যদিকে কমে আসছে কৃষি জমির পরিমাণ, যার কারণে সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, ভূমির অবক্ষয় একটি মারাত্বক পরিবেশগত সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মাটির গুণগত মান বজায় রাখা, নদীভাঙন নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা হ্রাস, পাহাড় রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

৫.৬.2024
(দীপংকর তালুকদার, এমপি)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, অবক্ষয় প্রতিরোধসহ বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ জুন ২০২৪ পালিত হচ্ছে।

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Land restoration, desertification and drought resilience' যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" এবং স্লোগান- '#Generation Restoration' যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'অবক্ষয়িত ভূমি পুনরুদ্ধার করি, মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধ করি'- যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। পৃথিবী বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণসহ বিভিন্ন দূষণ এবং সংকটের দুর্বিপাকে নিপতিত। এই সংকট বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির মুখোমুখি করেছে। বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন হেক্টর জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, যা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করেছে এবং সামগ্রীকভাবে জিডিপির অর্ধেককে ভীষণভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র কৃষক এবং প্রান্তিক দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, ভূমি ক্ষয়, খরা এবং মরুকরণের প্রভাবকে রোধ করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতিসংঘের একটি তথ্যমতে, ভূমি পুনরুদ্ধারে বিনিয়োগকৃত প্রতিটি ডলার ইকোসিস্টেমকে ৩০গুণ সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করতে পারে। ভূমি পুনরুদ্ধার জীবিকা বাড়ায়, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং চরম আবহাওয়ার প্রতি সহিষ্ণুতা তৈরি করে। ভূমি পুনরুদ্ধার কার্বন সঞ্চয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে ধীর করে। মাত্র ১৫ শতাংশ জমি পুনরুদ্ধার এবং ভূমি অবক্ষয় বন্ধ করে প্রত্যাশিত প্রজাতির বিলুপ্তি প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত রোধ করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক এটি স্বীকৃত যে, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জন্য ভূমি অবক্ষয় বা মরুকরণ একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা। তাই, বিশ্বব্যাপী মরুকরণরোধে জাতিসংঘ মরুকরণ রোধ কনভেনশন (UNCCD) গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ কনভেনশনটি স্বাক্ষর ও ১৯৯৬ সালের ২৬ জানুয়ারি অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ খরা ও ভূমি অবক্ষয়রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। খরা ও ভূমি অবক্ষয়ের বিষয়টি বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভূমি অবক্ষয়ের বিষয় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সেক্টর নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য খরা ও মরুময়তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত সুন্দর ও টেকসই পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণে সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪-এর গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

ড. ফারহিনা আহমেদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (Programme UN Environment) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য- "Land restoration, desertification and drought resilience" যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা; অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা"।

UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) সচিবালয়ের তথ্য মতে, গোটা পৃথিবীর প্রায় ৪০ ভাগ ভূমি অবক্ষয়িত যা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার উপর প্রভাব ফেলছে এবং এতে করে বিশ্ব জিডিপির প্রায় অর্ধেক (৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার) হুমকির মুখে পড়েছে। শুধু তাই নয় ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী খরার সংখ্যা এবং স্থায়ীত্বকাল প্রায় ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের জীবনযাত্রায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশংকা করা হচ্ছে। এর ফলে, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী মানুষের অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও পাবে।

পৃথিবীতে ভূমির অবক্ষয় দ্রুত বাড়ছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান কিন্তু জমি বাড়েনি। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা একই পরিমাণ ভূমি থেকে পূরণ করতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের মত ভূমির অবক্ষয়, দ্রুত ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ইত্যাদি আমাদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। দেশে প্রকৃত (Net) কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.৯৬ কোটি একর এ দাঁড়িয়েছে। নতুন ঘরবাড়ি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান/শিল্পাঞ্চল স্থাপন, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে আবাদযোগ্য জমি প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। দেশের ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন করা এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

GEF এর আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত "Land Degradation in Bangladesh 2020" শীর্ষক প্রকাশনায়, বাংলাদেশে ১২ ধরনের ভূমি অবক্ষয় চিহ্নিত করা হয়েছে যা সমগ্র দেশের প্রায় ৭৬.২%। এখানে আরও দেখা যায়, বাংলাদেশে ২০২০ সালে প্রায় ১১.২৪ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি মধ্যম থেকে অতি মাত্রায় অবক্ষয়ের শিকার। এছাড়া ইটভাটায় টপসয়েল ব্যবহার, পাহাড় কাটা ও জলাশয় ভরাট বাড়তি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ভূমি ক্ষয় ও খরা মোকাবেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, বাংলাদেশ যথাক্রমে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ সালে UNCCD স্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীতে তা অনুস্বাক্ষর করে। জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮-তে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমির অবক্ষয়রোধ ও খরা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা National Action Program (NAP) for Combating Desertification, Land Degradation and Drought for 2015-2024 গ্রহণ করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘের SDG 15 এবং UNCCD-এর Cop 13 এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও "ভূমির অবক্ষয় নিরপেক্ষতা লক্ষ্য" (Land Degradation Neutrality-LDN) নির্ধারণ করেছে। ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতীয় রোডম্যাপ ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন, টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি পুনরুদ্ধার, অবক্ষয়রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়াও ভূমি অবক্ষয় কমিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ইটভাটায় টপ সয়েলের ব্যবহার কমাতে সরকারি নির্মাণ কাজে ইটের পরিবর্তে ব্লক ব্যবহারের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে ভূমি অবক্ষয় রোধে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মরুময়তা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবের বিপরীতে ভূমি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ এ সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য UNCCD'র পরবর্তী Cop-16 এ বিশ্বব্যাপী ভূমি অবক্ষয়ের বিষয়ে যথাযথ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৪ এর সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ এবং টেকসই ভূমি উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০৫ জুন ২০২৪

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী গণমানুষের মধ্যে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থায় অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Land restoration, desertification and drought resilience" যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা; অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" এবং স্লোগান নির্ধারিত হয়েছে "Our Land. Our Future. We are #GenerationRestoration". এবারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ও স্লোগানের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তা প্রতিরোধ, খরা সহনশীলতা অভিযোজন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি, এনজিও প্রতিষ্ঠানসহ আপামর সকল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অপরিমিত রাসায়নিকের ব্যবহারে উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি, ভূগর্ভের পানি ক্রমশ হচ্ছে নিম্নগামী। বিলীন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ। উজাড় হচ্ছে বন, বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাস এবং তৃণ ও জলাভূমি। হারিয়ে যাচ্ছে নদী, জলাশয়, খাল, বিল ও ঝর্ণাধারা এবং একই সাথে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে আশংকাজনকভাবে; বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি আমরা। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান, আবাসন প্রকল্প, ইটভাটা স্থাপন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ভূমির আকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। আর সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ দূষণ; হচ্ছে ভূমির অবক্ষয়। পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা সীমিত পরিমাণ ভূমি থেকেই পূরণ করতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের মতো ভূমির অবক্ষয়, দ্রুত ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ইত্যাদি প্রতিনিয়ত আমাদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ফলে কোনো কোনো জমি অতিকর্ষণের শিকার হয়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ, গণসচেতনতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির অপরিহার্যতা বিবেচনায় এ বছর স্মরণিকাটিতে লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূমির অবক্ষয়, কৃষিজমির সংকট, ক্ষরাপ্রবণতা, মাটি-পানি-বায়ু দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দেশের বরেণ্য ব্যক্তি, পরিবেশবিদ, লেখক, গবেষক, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই স্মরণিকার লেখা পাঠে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক-পাঠিকাগণ প্রত্যাশিত উপকরণ পাবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত, সুপারিশ বা প্রস্তাবনা একান্তই লেখকদের নিজস্ব।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি; সম্মানিত সচিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যাঁদের লেখা ও ছবি স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে স্মরণিকাটির সম্পাদনা ও প্রকাশে যেসব সহকর্মীগণ অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদেরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে
দ্বাদশ জাতীয় সংসদের
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণের
সদয় দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য
আমরা কৃতজ্ঞ

জনাব দীপঙ্কর তালুকদার
সভাপতি

জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী
সদস্য

জনাব আ.স. ম. ফিরোজ
সদস্য

জনাব শাহাব উদ্দিন
সদস্য

জনাব মোঃ আবদুল ওদুদ
সদস্য

জনাব তানভীর শাকিল জয়
সদস্য

জনাব গালিবুর রহমান শরীফ
সদস্য

জনাব এস. এম. আতাউল হক
সদস্য

জনাব ছানুয়ার হোসেন ছানু
সদস্য

বেগম আরমা দত্ত
সদস্য

সূচিপত্র

বাংলা প্রবন্ধ

ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তা প্রতিরোধ ও খরা সহনশীলতা অর্জনসহ পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তর ২৩
ড. আবদুল হামিদ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগর পরিবেশ ২৮
নজরুল ইসলাম

আমাদের গ্লানি ও বেদনা ৩৩
ইনাম আল হক

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলার এখনই সময় ৩৫
মুকিত মজুমদার বাবু

প্রকৃতিতে প্রজাপতি ৩৭
ড. মো: মনোয়ার হোসেন

ন্যাপ এক্সপো ২০২৪ আয়োজন: বৈশ্বিক জলবায়ু অভিযোজন পথযাত্রায় বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন ৩৯
মির্জা শওকত আলী, মোঃ মাহমুদ হোসেন, উম্মে সালমা সুমি

সাম্প্রতিক ভূমিকম্প, ভূ-তাত্ত্বিক কারণ ও করণীয় ৪৪
মোহাম্মদ এমরান হোসেন

ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া ৫০
মো: সামসুজ্জামান সরকার

চামড়া শিল্পের উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা: ট্যানারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এ অবস্থিত ট্যানারীসমূহের প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণে করণীয় ৫৬
নাজিম হোসেন শেখ

পেপার মাছরাঙ্গা: একটি প্রাণের আত্মকাহিনী ৬২
খন্দকার মাহমুদ পাশা, আফরোজা ইসলাম শশী

শব্দদূষণ: অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ৬৪
মোঃ ফজলে এলাহী

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন, খরা ও পানি ব্যবস্থাপনা ৬৮
মোঃ রবিউজ্জামান

শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার (Zero Waste Dairy Farm) ৭১
ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, আনোয়ার হোসেন, ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান, আয়েশা সিদ্দিকা আফসানা সোনিয়া সুলতানা এবং ড. নাসরিন সুলতানা

পোল্ট্রি খামারে গন্ধ উৎপাদন, পরিবেশের উপর প্রভাব ও নিরসনের উপায় ৭৭
ড. সাবিহা সুলতানা, ড. শাকিলা ফারুক ও ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

২৮তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP28)-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ ৮০
মির্জা শওকত আলী, মোঃ হারুনুর রশীদ

সবুজ অর্থনীতি ৮৩
আবুল কালাম আজাদ

নগর কৃষি ও অক্সিজেন ব্যাংক ৮৬
আহসান রনি

কবিতা

কাব্যকথার সেই ছবিটি ৯১
পাশা মোস্তফা কামাল

এক মাছরাঙ্গা ৯২
খন্দকার মাহমুদ পাশা

পরিবেশ বিপর্যয় ৯৩
সালাহ উদ্দিন মিঠু

English Articles

Our Land, Our Future: Combating Desertification and Building Drought Resilience in Bangladesh 97
Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed, Mr. Md. Fozla Hossain

Towards Food Security through Sustainable Agriculture 102
Dr. Md. Sohrab Ali

Optimising Opportunities for Nature-based Solutions 105
Dr. Md. Saifur Rahman

PCB A Forgotten Legacy 108
Md. Hasan Hasibur Rahman

Can Community-based tourism facilitate to conserve the Sundarbans? 112
Md. Mozahidur Rahman

Light in a Nutshell 116
Md. Mahbubur Rahman Khan

Heat Stress and Dairy Cow Productivity: Challenges and Solutions for High-Yielding Cows 120
Dr. Md. Rakibul Hassan, Eashtiak Ahamed Pehan, Sonia Sultana, Anowar Hosen, Ayesha Shiddikka Afsana and Dr. Nasrin Sultana

Perspectives of Land restoration, desertification and drought resilience: Lesson Learns and What to do? 126
Maimuna Qazi, Mohammad Alamgir

A Vision for Environmental Justice and Sustainability 130
Poribeshbid Sk. Abu Jahid

Plastic Pollution's Persistent Threat to the Environment: A Silent Crisis 133
Istiak Ahmed

Land Degradation and Desertification in Bangladesh; Causes and Sustainable Solutions 135
Jannatuj Jeba Tamanna, Md. Alim Miah

বাংলা প্রবন্ধ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গ্রুপে শ্রেষ্ঠ মোঃ ওয়াছিউ আমিরুন নাহিন ভূঁইয়ার আঁকা চিত্র।

ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তা প্রতিরোধ ও খরা সহনশীলতা অর্জনসহ পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তর

ড. আবদুল হামিদ*

মাটি আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের আধার। এটি আমাদের অর্থনীতি, জীবন ও জীবিকার ভিত্তি। প্রত্যেকটি মানুষের সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য শক্তির (ক্যালরি) ৯৯% আসে ভূমি থেকে। সুতরাং, আমরা যে যেখানেই থাকিনা কেন, মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক মৌলিক এবং অত্যন্ত গভীর। মাটির গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে এ পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে ভূমির অবক্ষয়ের ফলে সভ্যতার পতন ঘটেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর "শিল্প বিপ্লব" এবং ১৯৬০ এর দশকে আবির্ভূত "সবুজ বিপ্লব" এর ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবস্থা পরিবীক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি ও সর্বসাধারণের সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এতদবিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের মানব পরিবেশের উপর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আলোকে ১৯৭২ সালে United Nations Environment Program-UNEP প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি UNEP-এর উদ্যোগে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ জুন "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনায় প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ও স্লোগান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "Land restoration, desertification and drought resilience" যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা; অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" এবং স্লোগান নির্ধারিত হয়েছে #Generation Restoration। নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ও শ্লোগানের মাধ্যমে মরুময়তা ও খরাজনিত কারণে ভূমি অবক্ষয় রোধকল্পে সরকারি কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভূমিক্ষয় ও মাটির গুণগতমানের অবনতি, ভূমির ব্যবহার ও আচ্ছাদনের পরিবর্তন, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয়, জীববৈচিত্র্যের অবলোপন, বর্জ্য ও ক্ষতিকর দ্রব্য সামগ্রীর অব্যবস্থাপনা, জলাভূমি ভরাট, পাহাড় কর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং আরো অনেক ধরনের পরিবেশগত অবক্ষয় ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে জনসাধারণকে। এপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন' (পঞ্চদশ সংশোধনী)। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে 'পরিবেশ সুরক্ষা' অন্যতম। এরূপ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাসহ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ বিষয়ক কারিগরি সংস্থা হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান বিকাশের উপজাত হিসেবে পৃথিবীতে ভূমির অবক্ষয় দ্রুত বাড়ছে। ২০১৫ হতে ২০১৯ সালের মধ্যে পৃথিবীতে ১০০ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য উর্বর জমি হারিয়ে গেছে যাতে ১.৩ বিলিয়ন জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন হেক্টর জমি অবক্ষয়িত হবে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান কিন্তু জমি ক্রমহ্রাসমান। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থেকে পূরণ করতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের মত ভূমির অবক্ষয় ও দ্রুত ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আমাদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। দেশে প্রকৃত (Net) কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.৯৬ কোটি একর এ দাঁড়িয়েছে। নতুন ঘরবাড়ি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান/শিল্পাঞ্চল স্থাপন, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে আবাদযোগ্য জমি প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। ফলে কোন কোন জমি অতিকর্ষণের শিকার হয়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন করা এখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

*মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবেশ অধিদপ্তর

দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবহার ও অবক্ষয়ের প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপনে কিছু সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এউঋ এর আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত "Land Degradation in Bangladesh 2020" শীর্ষক প্রকাশনায় বাংলাদেশে ১২ ধরনের ভূমি অবক্ষয় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ অবক্ষয়ের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৭১ হাজার কোটি টাকা নিরূপিত হয়েছে। দেশব্যাপী প্রতিবছর ১% কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হল- নদী ভাঙ্গন, পাহাড়-টিলা কর্তন-মোচন, টপ সয়েল অপসারণ (ইট ভাটায়), মাটিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, শিল্প-কারখানার দূষণে মাটি দূষণ এবং মাটির অম্লতা বৃদ্ধি ইত্যাদি, যার মাধ্যমে ২০২০ সালে দেশের প্রায় ১১.২৪ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি মধ্যম থেকে অতি মাত্রায় অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে।

ভূমি ক্ষয় ও খরা মোকাবেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) সনদে স্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তা অনুস্বাক্ষর করে। এছাড়া জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভূমির অবক্ষয়রোধ ও খরা মোকাবেলার মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার National Action Program (NAP) for Combating Desertification, Land Degradation and Drought for 2015-2024 শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘের SDG 15 Ges UNCCD-Gi COP 13 এর সিদ্বান্ত মোতাবেক ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও "ভূমির অবক্ষয় নিরপেক্ষতা লক্ষ্য" (Land Degradation Neutrality-LDN) নির্ধারণ করেছে। ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতীয় রোডম্যাপ ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন, টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি পুনরুদ্ধার ও অবক্ষয়রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া ভূমি অবক্ষয় কমিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প (যেমন টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন-Ecosystem based Adaptation) ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২৫ মেয়াদে বরেন্দ্র ও হাওর এলাকায় Ecosystem-based Approaches to Adaptation (EBA) in the Drought-Prone Barind Tract and Haor Wetland Area Project (EbA Project) এর কার্যক্রম পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে। ইবিএ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিবার্য অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম হিসেবে প্রকল্প এলাকায় মজাপুকুর পুনঃখনন, বন্ধ খাল পুনঃখনন, বনায়ন, সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM (Sustainable Land Management) Pratices in Sector Polices শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ভূমির অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলায় Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management শীর্ষক আঞ্চলিক একটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি- ২০১৮ তে উল্লিখিত ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি অবক্ষয় রোধ ও মরুময়তা বিস্তার রোধে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুসারে বিভিন্ন সময়ে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব এলাকার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। এসাথে বাংলাদেশ সরকার যথাক্রমে ১৯৯২ এবং ১৯৯৪ সালে UN Convention on Biological Diversity স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করে এবং এর ধারাবহিকতায় ২০০১ সালে কার্টাহেনা প্রোটোকল ও ২০১১ সালে নাগোয়া প্রোটোকল স্বাক্ষর করে। জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ জারি করে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP), ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework এর আলোকে হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের এরূপ পদক্ষেপসমূহের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

তবে এরূপ ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইট প্রস্তুতের জন্য মাটির অনিয়ন্ত্রিত ও সর্বনাশা ব্যবহার বৃদ্ধি। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ২০২১ সালে প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ৯২% সনাতন পদ্ধতিতে পোড়ানো ইট, ৭% উন্নত প্রযুক্তির ইট এবং

১% অপোড়ানো ব্লক বা অন্যান্য প্রযুক্তির ইট ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ০৮(আট) হাজার ইটভাটা রয়েছে। এ সকল ইটভাটায় বছরে প্রায় ৩৫০০ কোটি ইট পোড়ানো হয়। এ পরিমাণ ইট তৈরীতে প্রায় ১৩ কোটি মেঃ টন কৃষি মাটি ব্যবহার করা হয় এবং তা পোড়াতে প্রায় ৫৬ লক্ষ মেঃ টন এর মত কয়লা ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ইটভাটার কার্যক্রম পরিচালনা করে কৃষিজমির মাটির ব্যবহার, কৃষি জমি বিনষ্ট এবং ইটভাটায় জ্বালানী হিসাবে গাছপালা কেটে কাঠ পোড়ানোর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় ঘটানো হচ্ছে। ফলে এলাকাভিত্তিক ভূমির অবক্ষয়ের পাশাপাশি বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বায়ুদূষণ সৃষ্টির মাধ্যমে অকাল মৃত্যু ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কৃষি জমিতে ইটভাটা স্থাপন ও ইট তৈরিতে কৃষি জমির মাটি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উপর হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দেশের অতিমূল্যবান কৃষিমাটি (টপসয়েল) রক্ষার মাধ্যমে ভূমির অবক্ষয় রোধ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ১০০% ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইটের পরিবর্তে নদীর ড্রেজিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বালি দিয়ে ব্লক তৈরি করে তা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহারের বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক নির্দেশনা ভূমি অবক্ষয়রোধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এছাড়া, শিল্প-কারখানার দূষণে মাটি দূষণসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে Polluters Pay Principle কৌশলের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জুলাই ২০১০ হতে জলাশয় ভরাট, পাহাড়/টিলা কর্তন, কৃষিজমির ক্ষতি, নদীর পানিদূষণ, বায়ুদূষণসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১০ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ১৩,৮৬৭ টি শিল্পকারখানা/স্থাপনা/উন্নয়ন/প্রকল্প/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৫১৯.০৮৮৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ২৫১.৩৮৫৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ও অন্যান্য আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমে ১১৮০টি অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করাসহ ১১১.৫৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ/জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করে ক্ষতিপূরণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে সম্প্রতি তা হালনাগাদ করা হয়েছে। ভূমির অবক্ষয় রোধে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং তরল বর্জ্যের শূন্য নির্গমন (Zero Liquid Discharge) প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রচলনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৪৩ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইটিপি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া ৬৫৯ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। এছাড়া, আধুনিক ও ডিজিটাল উপায়ে শিল্পকারখানা মনিটরিং করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার শিল্পকারখানায় ইটিপিতে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর DDT পাউডার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও ভূমির ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে ২০২২ সালে, পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পের আওতায়, দেশকে DDT মুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বায়ু দূষক (যেমন ভারী ধাতু) প্রথমে মাটি থেকে গাছের শিকড়ে জমা হয়ে শিকড়ের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এবং শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শোষণে বাধা প্রদান করাসহ মানব-স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করে। এ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি CAMS ও C-CAMS এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৩১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা PM2.5 , PM10, SO_2, CO, NOx এবং O_3 সহ আবহাওয়াগত উপাত্তসমূহ নিয়মিত পরিমাপ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তরিত করে পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা (AQI-300) অতিক্রম করলে জনসচেতনতামূলক স্বাস্থ্য পরামর্শ বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া, একটি খসড়া জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Air Quality Management Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই তা চূড়ান্ত করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

আমেরিকার মৃত্তিকা বিজ্ঞান সোসাইটির তথ্যানুসারে, জলবায়ু হল পাঁচটি মাটি গঠনের প্রভাবকের একটি এবং মাটির বৈশিষ্ট্য গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তেমনিভাবে মাটি বায়ুমন্ডলের তুলনায় দুই থেকে তিনগুন বেশি কার্বন ধরে (store) রাখে। এভাবে উর্বর মাটি কার্বন সিংক হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কাজ করে থাকে। অন্যদিকে অবক্ষয়িত মাটি বা ভূমি গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণে ভূমিকা রাখে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ

প্রথম জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়নপূর্বক UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী NDC হালনাগাদের বাধ্যবাধকতা থাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC পর্যালোচনা (Review) ও হালনাগাদ (Update) করণপূর্বক বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে UNFCCC Secretariat -এ দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Updated NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বপ্রণোদিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬.৭৩% গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে এবং বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে আরও ১৫.১২% গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। উক্ত NDC-র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে। এছাড়াও UNFCCC-এর আওতায় এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক প্রতিবেদন UNFCCC সেক্রেটারিয়েট এ দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে ২০১৩-২০১৯ সময়ের জাতীয় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০) বা National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করে UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ ও জাতীয় উন্নয়ন রূপকল্প-২০৪১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে সৃষ্ট বিপন্নতা ও ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে একটি জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণু সমাজ গঠন করা। এই রূপকল্পে ৬ টি অভিযোজন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে একইসাথে ৮টি অগ্রাধিকার খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার ৯০ টি high priority এবং ২৩ টি moderate priority-সহ মোট ১১৩ টি interventions রয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে এ চিহ্নিত অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১.১ মিলিয়ন হেক্টর জমি রক্ষা পাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'Mujib Climate Prosperity Plan 2022-2041' প্রণয়ন করেছে যা মূলত আর্ন্তজাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। এ পরিকল্পনা বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা (Climate uvlnerability) থেকে জলবায়ু সহিষ্ণুতা (Climate resilience) এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম সম্পর্কিত পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ২২-২৫ এপ্রিল ২০২৪ সময়ে NAP Expo Bangladesh আয়োজন করেছে। LDC-ভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশই প্রথম NAP Expo আয়োজন করেছে। UNFCCC সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন যেখানে বিশ্বের ১০৩টি দেশের ৩৮৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। ভূমির যথাযথ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) গঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। সর্বশেষ ২০২২ সালে পেশকৃত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের পরিসরে দেশের মূল ভূমির তুলনায় অবক্ষয়িত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ০২- ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে সৌদি আরবের রিয়াদে, UNCCD এর COP ১৬ অনুষ্ঠিত হবে এবং একই সাথে এ কনভেনসনের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপিত হবে। উল্লেখ্য ভূমি পুনরুদ্ধার, খরা সহনশীলতা এবং সবুজ উত্তরণের (Green Transition) ক্ষেত্রে COP 16 একটি যুগান্তকারী ইভেন্টে পরিণত হতে যাচ্ছে। উক্ত COP-এর জন্য বিভিন্ন Working group কাজ করছে, যাতে পরিবেশ অধিদপ্তরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। COP 16 ভূমি অবক্ষয় নিরপেক্ষতা লক্ষ্য (LDN) অর্জনে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার (SLUS) উপর পর্যালোচনান্তে আন্তর্জাতিকভাবে হালনাগাদকৃত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। মূলত এ ইভেন্টকে গুরুত্ব দিয়েই এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে যাতে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার দায়িত্ব থাকায় এর টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ অন্যতম পূর্বশর্ত। ভূমি পুনরীজ্জীপনে এক ডলার ব্যয় করলে তা থেকে প্রায় ৩০ ডলার সমমূল্যের প্রতিবেশগত সেবা পাওয়া

সম্ভব। ভূমি পূনরুদ্ধার এর মাধ্যমে ভূমিতে কার্বন সংরক্ষণ বাড়বে এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি, এরূপ পদক্ষেপের ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর মাসব্যাপি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকাতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বির্তক প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও বিআইসিসি মাঠে সপ্তাহব্যাপি (৫-১১জুন, ২০২৪) পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণমুক্ত, খাদ্য নিরাপত্তায় সুনিশ্চিত একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টায় সরকার, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, প্রাইভেট সেক্টর, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে দেশে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরা সহিষ্ণুতা অর্জন এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব ভূমি সম্পদ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশ আরো একধাপ এগিয়ে যাবে, আজকের দিনে এটিই সকলের প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগর পরিবেশ

নজরুল ইসলাম*

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা খরা, শৈত্যপ্রবাহ, ভূমিধস, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, নদীভাঙন ও আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি।

বন্যা: নদী, খাল, বিল বা নিম্নভূমির ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পানির প্রবাহ যখন কূল ছাপিয়ে জনপদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ফসল, সহায়-সম্পত্তি প্লাবিত ও ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে বন্যা বলে। বাংলাদেশের মতো বৃষ্টিবহুল ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৌসুমি বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে বন্যা স্বাভাবিক ব্যাপার। বন্যা সাধারণত সংঘটিত হয় বর্ষাকালে। বন্যার কারণে শস্য, বসতবাড়ি ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয় এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক বন্যা শুরু হয় সাধারণত এপ্রিল ও মে মাসে প্রাক মৌসুমি বা বর্ষা পূর্ব সময়ে উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলে পাহাড়িয়া এলাকায় নদীতে আকস্মিক বন্যার মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে সংঘটিত বন্যার মধ্যে ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০ ও ২০২২ সালের বন্যা ছিল মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সর্বসম্প্রতি ২০২০ সালে উত্তরাঞ্চলে এবং ২০২২ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেটের বন্যাও ছিল ব্যাপক ক্ষতিকারক ও দীর্ঘমেয়াদী। ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের বন্যা মানব ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অন্যতম ভয়াবহ বন্যা। ১৯৮৮ সালের বন্যায় দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূভাগ বন্যা কবলিত হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাত, প্রধান প্রধান সবগুলো নদীর একই সাথে সর্বোচ্চ প্রবাহ, পানির বিপরীতমুখী প্রবল চাপ এ সব বিষয় এক সাথে মিলে ২৩ দিন স্থায়ী ইতিহাসের এই ভয়াবহতম বন্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৮ সালের বন্যায় পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী উপত্যকা ও সংলগ্ন এলাকা এবং বাংলাদেশের মধ্য অংশসহ দেশের ৪৫% এর বেশি এলাকা প্লাবিত হয়। ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে বন্যার পানির উচ্চতা ছিল যথাক্রমে ৭.৫৮ মিটার এবং ৬.৫৮ মিটার। ১৯৯৮ সালের বন্যার স্থায়িত্ব ছিল ৬৪ দিন, যা ১৯৮৮ সালের বন্যার স্থায়িতের তুলনায় ২.৭৮ গুণ বেশি। ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে প্রবল বর্ষণের ফলে ২০০০ সালে বাংলাদেশে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলায় বন্যা সংঘটিত হয়েছিল। এ বন্যায় প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের প্রায় ২৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা (মোট ভূভাগের ১৮%) প্রতি বছর বন্যা কবলিত হয়। বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে এলাকার পরিমাণ ৫৫% ছাড়িয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এর সাথে আরও এলাকা বন্যায় সংযুক্ত হলে জনপদের অবস্থার অবনতি হয় এবং বন্যা অনেক ভয়ংকর আকার ধারণ করে ব্যাপক ধ্বংস, ফসল, গৃহ, রাস্তা ও অবকাঠামো নষ্ট এবং হতাহতের ঘটনা ঘটায়। জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি জেলার ব্যাপক এলাকা বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের বন্যার ভয়ংকর রূপ সরকারকে বন্যা সমস্যার স্থায়ী নিরসন কল্পে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৮৯ সালে বন্যা সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়। এর ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ফ্লাড অ্যাকশন প্লান (ঋঅচ) তৈরি করে।

খরা: অস্বাভাবিক কম বৃষ্টিপাতসহ বিরতিহীন দীর্ঘসময়ব্যাপী শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করার কারণে সাধারণত খরার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবন বেশি হলে সাধারণত এমন হয়। খরায় দাবদাহের কারণে পানি স্বল্পতা ও আর্দ্রতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়, নদী প্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভের পানি স্তর নিচে নেমে যায়, কূয়া, খাল, বিল, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যায়, খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খরা পরিস্থিতি দুর্বিসহ করে তোলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে। উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চল দিয়ে সর্বমোট ৫৭টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সংশ্লিষ্ট উৎস দেশে পানির ব্যবহারসহ বাঁধ নির্মাণের ফলে এসব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়। যেমন, গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ, পুনর্ভবা (বাংলাবন্ধের বিপরীতে), তিস্তা নদীর বাঁধ এ সব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাঁধের ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ কমায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পানি সংকট তৈরি হয়। ভূপৃষ্ঠস্থ পানির যোগান ব্যাহত হওয়ায় বিস্তৃত

* ইমেরিটাস অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
প্রতিষ্ঠাতা সাম্মানিক চেয়ারম্যান, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

এলাকা জুড়ে আর্দ্রতা হ্রাস পায় ফলে দেশে খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাংলাদেশে খরার প্রাদুর্ভাব ঘটে বর্ষার আগে ও পরে। শুষ্ক অবস্থা ও মৃত্তিকায় আর্দ্রতার উপস্থিতি কম থাকার কারণে দু'টি খরা সংকট কাল চিহ্নিত করা হয়, একটি খরিফ খরা (জুন-জুলাই থেকে অক্টোবর) এবং অন্যটি রবি খরা (জানুয়ারি থেকে মে)। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজশাহী বিভাগের উষ্ণ ও অর্ধশুষ্ক বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা যেমন, বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট এবং নওগাঁয় সবচেয়ে বেশি খরা দেখা যায়। খরা প্রবণ এবং খরা প্রবণ নয় দেশের এমন সব এলাকায় এ দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে। সাধারণত খরায় মৃত্তিকায় শস্য উৎপাদন উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্দ্রতা না থাকায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। খরিফ খরায় মৎস্য চাষ ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ড এবং রবি খরায় বোরো, গম, ডাল, আলু, রোপা আউশ ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রচণ্ড খরায় আমন ও অন্যান্য প্রকার ধানের উৎপাদন কমে যেতে পারে ২০ থেকে ৬০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি। এ সব কোন কোন খরা দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। ১৯৯০ দশকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খরায় ধান উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন কমে যায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাংলাদেশে সমসাময়িক কালে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খরার ফলে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে।

ঘূর্ণিঝড়: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস- এসব মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং এর বিধ্বংসী প্রভাব দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও অনেক মানুষ এ সব বিপদসঙ্কুল উপকূলীয় এলাকায় বসতি স্থাপনে বাধ্য হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আজও উপকূলীয় এলাকায় অন্যতম মৃত্যু ঝুঁকি। দেশের প্রায় ৩৫% এলাকা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ, এর মধ্যে ৭.৩৬% এলাকা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে সংঘটিত ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বেশিরভাগ উৎপত্তি স্থল বঙ্গোপসাগর। বছরে গড়ে ১৬টি ঘূর্ণিঝড়ের বেশিরভাগ সাধারণত বর্ষা মৌসুমের আগে (এপ্রিল-মে) ও পরে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) হয়। বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ও তীরবর্তী শত শত দ্বীপে বসবাসরত ৪০ মিলিয়নেরও বেশি দরিদ্র মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হুমকির মুখে আছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সবচেয়ে বেশি প্রাণ ও সম্পদ বিনষ্টকারী মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় হয় ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে। ঘণ্টায় ২২৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত এ ঘূর্ণিঝড়ের সাথে ৬-১০ মিটার জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা ভোলা ও দ্বীপাঞ্চলে অন্যূন ৩,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু এবং ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়। এর দু'দশকের কিছু পরে ২৯ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে অন্য আর একটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত এ ঘূর্ণিঝড়ে সরকারি হিসাবে ১,৩৮,৮৮২ মানুষের মৃত্যু এবং ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম আর একটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' সংঘটিত হয় ২০০৭ সালে নভেম্বর মাসে। সিডরের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত এ ঘূর্ণিঝড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু এবং প্রভূত সম্পদের ক্ষতি হয়। ২০০৯ সালে মে মাসে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' এবং ২০২০ সালে মে মাসে 'আম্ফান' সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে সংগঠিত সর্বশেষ ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'রিমেল' হলো ২৬ মে, ২০২৪ তারিখের ঘূর্ণিঝড়টি। উন্নত মানের পূর্বাভাস ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও বেসকারি সংস্থাসমূহের সাবধানতা ও তৎপরতায় প্রাণহানির সংখ্যা সামান্য (আনুমানিক ১৩ জন) তবে সম্পদ ও ফসলের ক্ষতি ও জীবন জীবিকার ওপর প্রভাব অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশে ৩৫০০ এর বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে, যার সবগুলোই উপকূলীয় এলাকায়। সবচেয়ে বেশি ৬৭৯টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে চট্টগ্রামে, এরপর ভোলায় ৬৭৭টি এবং কক্সবাজারে ৬২১টি । ২৬ মে ঘূর্ণিঝড় রিমেলে অন্যূন ৮ লক্ষ এলাকাবাসীকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

নদীভাঙন: নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্লাবন সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা-এসব প্রধান নদী ব্যবস্থায় নদীভাঙন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। নদীর সর্পিল গতিপথ, নদীতে চরের প্রবণতা, মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে ধেয়ে আসা প্রবল পানির তোড় নদীভাঙনের অন্যতম কারণ। কখনও কখনও ভাঙন কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে নদীর গতি পথ পরিবর্তন করে দেয়। নদীভাঙনের কবলে পড়ে নদী তীরবর্তী ব্যাপক এলাকায় গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। জমি, শস্য, গবাদি পশু, ঘর-বাড়িসহ জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। প্রতি বছর নদীভাঙনের ফলে হাজার হাজার পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। অন্যান্য যে কোন দুর্যোগের তুলনায় নদীভাঙনে ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি নদীভাঙন দেখা যায় সিরাজগঞ্জ জেলায়। অন্যান্য নদীভাঙন প্রবণ জেলাগুলো হলো উত্তরবঙ্গে বগুড়া, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও রংপুর; ঢাকা অঞ্চলে চাঁদপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর ও ফরিদপুর; ময়মনসিংহ অঞ্চলে টাঙ্গাইল ও জামালপুর এবং উপকূলীয় পটুয়াখালী জেলা। সম্প্রতি পদ্মার ডান তীর ভাঙনে শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা মারাত্মক ভাঙনের কবলে পড়ে। দেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা নদীভাঙন কবলিত, এরমধ্যে ৩৫টি উপজেলার পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক। প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙনের শিকার হয়। ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে পদ্মা, কালীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর নদীভাঙনে একমাত্র মানিকগঞ্জ

জেলায় ৪২০টি গ্রাম বিলীন হয়ে যায়। চাঁদপুর, ভৈরববাজার, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামসহ অনেকগুলো প্রধান শহর বিপদের ঝুঁকিতে আছে এবং প্রতিনিয়ত ভাঙনের কবলে পড়ছে।

এ পর্যন্ত নদীভাঙন দুর্যোগ প্রতিরোধে সামান্যই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অভিযোজনের ব্যবস্থা হিসেবে নদীভাঙন এলাকা ছেড়ে দূরে সরে যাওয়া অথবা বাড়ি-ঘর সহজে খুলে নেয়া যায় বা স্থানান্তর করা যায় এমন অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। নদীভাঙন কবলিতদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া ও কবলিত এলাকায় বসবাসরতদের জন্য নদীভাঙন বীমা এবং নিরাপদ ও পরিকল্পিত এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। এসব এলাকায় সরকার সাধারণত কাঠামোগত দিকটির প্রতি বেশি নজর দেয়। তবে, সামাজিক গবেষকরা অকাঠামোগত বিষয়ের উপরও গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে মনে করেন। বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা সাধারণত উর্বর হওয়ায় এখানে বসতি অনেক ঘন। প্রতিটি দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে অনেকে চলে গেলেও বেশিরভাগ মানুষই থেকে যায় এবং নতুন মানুষ এসে যোগ দেয়।

ভূমিধস: প্রবল বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে শিলাখণ্ড বা ভূমিস্তূপ ধসে নিচে পড়ে ভূমিধস ঘটায়। বাংলাদেশে পাহাড়িয়া এলাকায়, বিশেষকরে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা বেশি হয়। চট্টগ্রাম নগরে পাহাড়ের ঢালে অবৈধ বসতি এলাকায় ঘন ঘন ভূমিধসের ফলে জীবনহানি ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংলগ্ন পাহাড়ে ভূমিধসের ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিগত পাঁচ দশকে অনেকগুলি বড় ধরনের ভূমিধস সংঘটিত হয়। যেমন, ১৯৬৮ সালে কাপ্তাই-চন্দ্রঘোনা সড়কে, ১৯৯৭ সালে বান্দরবানের চড়াইপাদা বা ভূমিধস, ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম শহরে এবং ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও চট্টগ্রাম শহরের একাংশে মারাত্মক ভূমিধস হয়। চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়ের ঢালে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত ভূমিধসের ফলে প্রভূত জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়। তারপরও এসব ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসতি নির্মাণ থেমে নেই। মানব বসতির সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর কার্যক্ষম নজ প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ভূমিধসের ক্ষয়-ক্ষতি কমানো যেতে পারে।

ভূমিকম্প: ভূমিকম্প হলো পৃথিবী পৃষ্ঠের আকস্মিক ও স্বল্পস্থায়ী কম্পন। মহাদেশীয় প্লেটের সংযোগ সীমান্তে অবস্থান, ভূ-অভ্যন্তরে ভাঁজ, চ্যুতি বা ফাটলের উপস্থিতি এবং ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ায় বাংলাদেশে প্রায়ই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের প্রভাবে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতিসহ ভূমিরূপের পরিবর্তন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বন্যা, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ সংঘটিত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতার মাত্রা পরিমাপের জন্য রিখটার স্কেল ব্যবহৃত হয়। ভূমিকম্পের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারণের জন্য চট্টগ্রামে ১৯৫৪ সালে দেশের একমাত্র ভূকম্পন মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫০ বছরের ভূকম্পন তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯৬০ সালের পরে বেশি হারে ভূমিকম্প হয়। ভারতীয় উপ-মহাদেশে সংঘটিত যেসব মারাত্মক ভূমিকম্পের প্রভাব বাংলাদেশে পড়ে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কাছাড় ভূমিকম্প (১৮৬৯), বেঙ্গল ভূমিকম্প (১৮৮৫), গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প (১৮৯৭), শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প (১৯১৮), ধুবড়ি ভূমিকম্প (১৯৩০) এবং আসাম ভূমিকম্প (১৯৫০)। এসব ভূমিকম্পের মধ্যে গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প এবং আসাম ভূমিকম্পে তীব্রতার মাত্রা ছিল সবচেয়ে বেশি, রিখটার মাত্রা যথাক্রমে ৮.৭ ও ৮.৪। অবশ্য আসাম ভূমিকম্প বাংলাদেশ অনুভূত হলেও ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। বাংলাদেশের অবস্থানই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায়। সামগ্রিকভাবে ভূমিকম্পের প্রভাব বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি হলেও রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, নড়াইল, চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য এলাকাও প্রভাবিত হয়।

আর্সেনিক দূষণ : সম্প্রতি বাংলাদেশে দূষণের নতুন সংযোজন আর্সেনিক। প্রকৃতিতে বিরাজমান সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক মানব স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুমোদিত খাবার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম, যদিও বাংলাদেশে ধরা হয় প্রতি লিটারে ০.৫ মিলিগ্রাম। তবে, সাম্প্রতিককালে পরিবেশে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি, পানি ও বাতাসে আর্সেনিক দূষণ দেখা যায়। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি, পানি ও বাতাসে আর্সেনিক দূষণ দেখা যায়। আর্সেনিক দূষণের উৎস হিসেবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, বর্জ্যপদার্থ অবক্ষেপণ এবং আর্সেনিক যৌগ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত বৈদ্যুতিক লাইনের কাঠের খুঁটি, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং আয়রন অক্সিহাইড্রক্সাইড বিজারণ ইত্যাদি ঘটনাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। আর্সেনিক দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পৃথিবীতে ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণে বাংলাদেশ অন্যতম। দেশের প্রায় ত্রিশ শতাংশ মানুষ বর্তমানে আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকির মধ্যে আছে। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলা আর্সেনিক দূষণযুক্ত। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বিদ্যমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আর্সেনিক দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

গৃহস্থালি কাজে আর্সেনিক দূষণ প্রশমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে আছে ৩-কলস, সাফি ফিল্টার, ২-বালতি, নিষ্ক্রিয় অবক্ষেপ ইত্যাদি। খুবই অগভীর নলকূপ (<১০ মিটার গভীর) বা গভীর ভূগর্ভস্থ পানি (>১৫০ মিটার) উভয়ই দীর্ঘ

মেয়াদে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তবে ভূপৃষ্ঠের পানিও নিরাপদ। মানিকগঞ্জ, মেহেরপুর এবং সাতক্ষীরায় বেশ কিছু আর্সেনিক পরিশোধন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টির পানিও আর্সেনিকমুক্ত পানির একটা ভাল উৎস। এ কারণে বৃষ্টির পানি ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন

কোন স্থানের আবহাওয়ার ধীর এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন হলো জলবায়ু পরিবর্তন। কোন স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যালোক, মেঘাচ্ছন্নতা ইত্যাদি আবহাওয়া উপাদানের দীর্ঘদিনের (২০-৩০ বছরের) গড় অবস্থা হলো জলবায়ু। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব আবহাওয়া উপাদানের ভারসাম্য প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে বজায় রাখে। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড আবহাওয়া উপাদানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এনে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। জলবায়ু পরিবর্তন হলো পৃথিবীতে গড় আবহাওয়া বিন্যাসের ধীর এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন- যার ফলে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক জলবায়ু প্রভাবিত হয়। পরিবর্তন সাধিত হয় তাপমাত্রা ও অন্যান্য উপাদানে। একবিংশ শতাব্দিতে পৃথিবীতে পরিবেশের অন্যতম সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তন।

পৃথিবীর উষ্ণতা প্রাকৃতিক এবং মানবীয় এ দুধরনের কর্মকাণ্ডের প্রভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। পৃথিবীতে তাপের অন্যতম প্রধান উৎস সূর্য। বায়ুমণ্ডলে সূর্যরশ্মির আগমন এবং প্রতিফলিত হয়ে তা আবার মহাবিশ্বে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য বজায় থাকে। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সূর্যের সরাসরি তেমন কোন ভূমিকা নেই। বায়ুমণ্ডল তাপ ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু গ্যাসীয় উপাদান গ্রীণহাউজের ভূমিকা পালন করে। তাপ ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন এ গ্যাসগুলোকে গ্রীণহাউজ গ্যাস বলে। জলীয়বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজন, মিথেন ও নাইট্রাস-অক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক গ্রীণহাউজ গ্যাস। পৃথিবীতে তাপমাত্রার স্বাভাবিক ভারসাম্যের জন্য অবশ্য বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাসের প্রয়োজন আছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাসের বিশেষকরে জলীয়বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের স্বাভাবিক প্রভাব না থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা -২০° সেলসিয়াসে নেমে আসতো। সমস্যা তৈরি হয় প্রকৃতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজন, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড ও ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের মতো গ্রীণহাউজ গ্যাসের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হলে। জীবাশ্ম জ্বালানির অস্বাভাবিক ব্যবহার, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, বনভূমি উজাড় ইত্যাদি কারণে গ্রীণহাউজ গ্যাসের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানবীয় কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের (সিএফসি) মতো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ হচ্ছে। শিল্প-কারখানা, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার (এসি), ফায়ার ইক্সটিঙগুইশার (অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র) এসব থেকে বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘস্থায়ী ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস যুক্ত হচ্ছে। ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরেরও ক্ষতি করে থাকে।

অস্বাভাবিক হারে এসব গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরু ও অন্যান্য অঞ্চলের হিমবাহ বা বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের উপকূলভাগে নিম্ন সমভূমির বিস্তৃত এলাকা তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে স্থলভাগের অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশের ফলে কৃষিকাজ ও মৎস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে (ইউএনসিইডি) সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ পেরু সম্মেলনেও জলবায়ু সমস্যা সমবেত মোকাবিলার কথা বলা হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ প্যারিসে ১৮৯টি দেশের উপস্থিতিতে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত এবং ৪ নভেম্বর ২০১৬ কার্যকর চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াস নিচে, ১.৫° সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

বৈশ্বিক উদ্যোগের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। গবেষণায় মাত্রার তারতম্য থাকলেও ধারণা দেয়া হয় বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যাবে, স্থানান্তরিত হতে হবে বিপুল সংখ্যক মানুষের। বাংলাদেশ এমনিতে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে বাড়বে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, মৌসুমি বৃষ্টিপাত (১০-১৫%), তাপ-প্রবাহ, নদীভাঙন, ভূমিধস, বন্যা ও জলাবদ্ধতা এবং বৃদ্ধি পাবে খরা, মহামারী, বিপন্ন হবে জীববৈচিত্র্য।

পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের দায় বাংলাদেশের অতি সামান্য থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। এ দায় থেকে মুক্ত হওয়া বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, সচেতন থাকলে এবং পরিকল্পিত ও সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি অনেকাংশে কাটানো সম্ভব। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গ্রীণহাউস গ্যাস কমানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পরিবেশবান্ধব গাছ লাগানো, বৃক্ষরোপন অভিযান জোরদার এবং বন সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়নের ওপর

গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ছাড়াও নদী, জলাশয় সংরক্ষণ, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতি ও গবেষণার ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি জলবায়ু তহবিল বাড়ানোর প্রতি সচেষ্ট রয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখছেন। বর্তমান প্রবিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এম.পি মহোদয়ও জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও জলবায়ু গবেষকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য।

নগরীয় পরিবেশ

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে দ্রুত নগরায়ত হচ্ছে। গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অভাব ও অপর্যাপ্ত সেবা-পরিষেবা এবং অন্যদিকে শহরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মানুষকে শহরমুখী করে তুলছে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে ১৭ শতকের পরিবেশ বান্ধব নান্দনিক শহর ঢাকা এখন আর আগের মতো নেই। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের কারণে যানজট, জলজট, জ্বালানিজট, পরিবেশ দূষণ, তাপদাহ ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে। আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বর্জ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে না ওঠায় টেকসই নগর পরিবেশ নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। নগরায়ণ ও নগর পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্যতা রয়েছে। জিএইচজি স্যাট এর তথ্য অনুযায়ী ১৮১ একর আয়তনের ঢাকার মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার গাড়ির বায়ু দূষণের সমান ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ কেজি মিথেন নিঃসারণ হয়। নগরীতে জলাশয়, উন্মুক্ত এলাকা, পার্ক ইত্যাদির দ্রুত নিঃশেষ প্রক্রিয়ার প্রভাবে বর্তমানে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ঢাকা শহরে জনসংখ্যা হিসাবে যেখানে দেড় হাজার খেলার মাঠ থাকার কথা সেখানে আছে মাত্র প্রায় ২৫০টি। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক খোলা এলাকা নিঃশেষ প্রক্রিয়া অবিলম্বে রোধ করতে হবে। পৃথিবীতে বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান অন্যতম শীর্ষে। ঢাকার বাতাসে ধূলিকণা বা অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার (পিএম ২.৫) উপস্থিতি ৭৯.৯ মাইক্রোগ্রাম, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি। যানবাহন, শিল্প-কারখানা, অস্বাস্থ্যসম্মত চুলা, ইটভাটা ইতাদির ধোঁয়া এবং রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণ কাজের ধুলা ঢাকা শহরে বায়ূদূষণের অন্যতম কারণ। বায়ুদূষণের মতো ঢাকা শহরে শব্দদূষণও মাত্রাতিরিক্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূচকে শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ঘরের ভেতর ৫৫ ডেসিবেল এবং বাইরে বাণিজ্যিক এলাকায় ৭০ ডেসিবেল। ঢাকায় এ মাত্রা ১১৯ ডেসিবেল এবং রাজশাহীতে ১০৩ ডেসিবেল। যাবাহনের হর্ন, স্থাপনা নির্মাণ, মাইক ইত্যাদি মূলত শব্দদূষণের কারণ। শব্দদূষণের ফলে শ্রবণশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাতসহ উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং মানসিক উদ্বেগ ও মনোযোগ সমস্যা দেখা যায়। শব্দদূষণে মানুষের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। ঢাকা শহরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও উদ্বেগের বিষয়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১° থেকে ১.৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলেও ঢাকায় আরো অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের কোন শহরে আদর্শ হিসেবে সবুজ এলাকা ২৫% এবং জলাশয় ১০-১৫% থাকার কথা থাকলেও কোন কোন সূত্রমতে ঢাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা বাড়ার পাশাপাশি রাজধানীর সবুজ এলাকা কমে মাত্র ৯%, জলাভূমি ২.৯% দাঁড়িয়েছে। সবুজ এলাকা তাপমাত্রা হ্রাসে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসাবে শাহবাগে তাপমাত্রা যখন ৩৮.৬° সেলসিয়াস তখন এর বিপরীতে কয়েকশ গজ সামনে রমনা পার্কের সবুজ এলাকায় তাপমাত্রা দেখা গেছে ৩৫.৭° সেলসিয়াস। ২০২৪ সালে এপ্রিল মাসে বংলাদেশ ভয়ঙ্কর তাপদাহের (৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তদোর্ধ) অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এই তীব্র তাপদাহে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হয়। হিটস্ট্রোক, চর্মরোগ, পেটের পীড়াসহ নানা রকমের স্বাস্থ্যগত জটিলতার ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে তাপদাহ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিপজ্জনক প্রকাশ।

উপসংহারে বলা যায়, দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের ফলে বাংলাদেশের নগর পরিবেশ বসবাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে সরকার, নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি নাগরিক, সকলেরই ইতিবাচক বলিষ্ঠ ভূমিকা আবশ্যক। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের সকলের পরিবেশ সচেতন হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের ভূগোল, নগর গবেষণা কেন্দ্র ও চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০২৪
সালমা এ. শফি, "নগরায়ন ও পরিবেশ: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা", নগর গবেষণা কেন্দ্রের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, ১৮ মে, ২০২৪।
আবদুস সাদিক, গবেষণা সহযোগী, নগর গবেষণা কেন্দ্র।

আমাদের গ্লানি ও বেদনা

ইনাম আল হক*

পৃথিবীর প্রকৃতিতে কোন ব্যাক্টেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবদান কতটুকু সেটা বলা সহজ নয়। গত ৩৫০ কোটি বছরে পৃথিবীতে যত কিসিমের প্রাণের উদ্ভব হয়েছে তার ৯৯% ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণ-প্রকৃতির নানা পরিবর্তনের পরও পৃথিবী অটুট রয়েছে। প্রতিটি ধ্বংসের দু-দশ কোটি বছরের মধ্যে নতুন প্রাণের সম্ভার দিয়ে ভরে গেছে প্রকৃতি। নবীন প্রাণের নতুনতর ও পরিবর্তিত জীবনপদ্ধতি দিয়ে পৃথিবীর প্রকৃতি বারবার পুনর্গঠিত হয়েছে। কোনো ব্যাক্টেরিয়া, উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অভাবে পৃথিবীর প্রকৃতি অপ্রকৃতিস্থ হয়নি। দশ হাজার কোটি বছর পর পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রকৃতি হয়তো এভাবেই বারবার পুনর্গঠিত হতে থাকবে।

পৃথিবীতে পাঁচটি মহাপ্রলয় ঘটেছে। এক মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর প্রায় ৯৫% প্রাণী ধ্বংস হয়েছে। বাকি পাঁচ শতাংশের মধ্য থেকে পৃথিবীতে নতুন প্রাণের বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে যে প্রলয় ঘটেছিল তার ফলে ডাইনোসর যুগের সমাপ্তি ঘটে। তারপরেই স্তন্যপায়ী প্রাণীর বারবাড়ন্ত হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি বছর আগে আমাদের মত বিশাল মগজধারি স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রসার ঘটেছে। ওই সময়ে অনেক প্রজাতির হোমিনিড ও মানুষের উদ্ভব হয়েছে। সেই সব মানুষের মধ্যে হোমো-ইরেক্টাস, নিয়ানডারথাল, ডেনিসোভান, ফ্লোরসিয়েন্সিস ইত্যাদি বেশ কয়েক প্রজাতির মানুষ সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু আমরা হোমোসেপিয়েন্স আজও টিকে আছি।

আমরা টিকে আছি এবং টিকে থাকতে চাই। আমাদের টিকে থাকার জন্য প্রকৃতিতে যা প্রয়োজন তা নিয়ে আমরা ভাবনা-চিন্তা করি। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে পৃথিবীতে অক্সিজেনের প্রয়োজন, গাছের প্রয়োজন, মাছের প্রয়োজন, পাখির প্রয়োজন, বাঘের প্রয়োজন ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই বলা হয় পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার জন্য কী প্রয়োজন সে কথা মনে রেখে ৬পৃথিবীর প্রয়োজন৯ বললেও আমরা আসলে বোঝাই 'আমাদের প্রয়োজন'। আমাদের কোনো প্রয়োজন সত্যই প্রকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এ সবই আমাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্র।

অনেক সময় আমরা বলি, 'প্রকৃতির ক্ষতি হবে' অথবা 'প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হবে'; এমন কি বলে ফেলি 'প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে'। এর কোনটাই কিন্তু সঠিক নয়; এ সব কথা আমরা কাব্য করে বলি আর কি! বিশ্বপ্রকৃতি কোন সজ্ঞান ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, বিরক্তি, উষ্মা ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত কোনো শক্তি নয়। এমনকি প্রকৃতি কোন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ব্যবস্থাপনাও নয়। আমাদের জানামতে প্রকৃতির কোন লক্ষ্য নেই। প্রকৃতির কোন লক্ষ্য থাকলেও তা আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান এমনকি সুচিন্তিত অনুমানেও তা ধরা পড়েনি।

একসময় প্রায় পুরো পৃথিবীটাই তো বরফে ঢেকে ছিল। সাহারা মরুভূমিতে ছিল বনভূমি। অন্য এক যুগে অ্যান্টার্কটিকায় ছিল গহীন বন। এখন সে সব বদলে গেছে। পৃথিবী তাতে বেদনার্ত কিংবা উল্লসিত হয়েছে এমন মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। আমরা জানি, গত দুই শত বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। হয়তো মহাদেশগুলোর অনেক অংশই ডুবে যাবে। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি এক কালে বায়ুমন্ডলে আজকের চেয়ে অনেক বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড দিয়েছিল। তখন মহাদেশগুলোর অনেক অংশ ডুবে যায়; এবং কোটি কোটি বছর পর বরফযুগ না আসা পর্যন্ত তা আর জাগেনি। তখন জলবায়ুর বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু প্রকৃতির তাতে কোন অসুবিধা হয়নি এবং পৃথিবীর কিছু এসে যায়নি। তখন ওসব পরিবর্তনের কথা আগাম জানার মতো কোনো প্রাণীও তো পৃথিবীতে ছিল না।

আজকের পৃথিবীর চিত্র একেবারেই ভিন্ন। এখন আমরা রয়েছি এই ভূপৃষ্ঠে এবং আমরা আগামী দিনের কথা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে পারি। পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমরা অনেক কিছু জেনেছি এবং আমরা এ পৃথিবীর বর্তমান পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ পরিণতির আগাম হিসেব করতে শিখেছি। এই পরিবর্তনের সাথে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্নও জড়িয়ে আছে বলে স্বভাবতই আমরা এ নিয়ে দুর্ভাবনা না করে পারিনে। সর্বোপরি এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডই দায়ী বলে গ্লানি ও বেদনার ভারও বহন করে চলেছি।

* প্রকৃতি পাখি পর্যবেক্ষক

এর আগেও পৃথিবীর এক প্রকারের প্রাণির কর্মকাণ্ডে প্রকৃতির বিশাল পরিবর্তন ঘটেছিল। আমরা একে সায়ানোব্যাক্টেরিয়া বলে থাকি। এই ব্যাক্টেরিয়া পৃথিবীতে অক্সিজেন নামের সহজদাহ্য গ্যাস দিয়ে ভরে দিয়েছিল। পৃথিবীর অ্যানারোবিক প্রাণের জন্য সেটা ছিল একটি মহাপ্রলয়। কিন্তু সেই প্রলয়ের জন্য সায়ানোব্যাক্টেরিয়া মোটেই উদ্বিগ্ন হয়নি এবং নিজেদের আচরণ বদলানোর কোনো চেষ্টা করেনি। তার কারণ সেই প্রলয়ে সায়ানোব্যাক্টেরিয়ার কোন ক্ষতি হয়নি এবং নিজ আচরণের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি জানা কিংবা অনুমান করার ক্ষমতাও তার ছিল না।

আমরাও এখন বায়ুমণ্ডলে গ্যাস দিয়ে ভরে ফেলছি, অনেকটা সেই সায়ানোব্যাক্টেরিয়ার মতোই। এবারের গ্যাসগুলোর নাম কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া। সায়ানোব্যাক্টেরিয়ার সাথে আমাদের পার্থক্য এই যে আমাদের গ্যাসে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং এই ক্ষতির কথাটা জানা ও তার পরিমাণ হিসাব করার ক্ষমতাও আমাদের আছে। কিন্তু এত সব জানার পরেও আমরা নিজেদের আচরণ বদলানোর ক্ষেত্রে সায়ানোব্যাক্টেরিয়ার চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর একথা বলতে পারি কি!

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলার এখনই সময়

মুকিত মজুমদার বাবু*

বর্তমান বিশ্ব যে-সব পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ অন্যতম। প্লাস্টিক দূষণ এমন একটি সমস্যা যা সমুদ্র থেকে স্থলভূমি তথা পৃথিবীর প্রতিটি কোনে বিরাজমান। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের জলপথকে দূষিত করছে, সামুদ্রিক জীবনের ক্ষতি করছে এবং মানবস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলছে। মারাত্মক আকার ধারণ করার আগে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিহত করা প্রয়োজন।

প্লাস্টিক একটি অপচনশীল রাসায়নিক পদার্থ। ব্যবহারের পর যে সব প্লাস্টিক ফেলে দেয়া হয়, তার অধিকাংশই প্রায় হাজার বছর পরিবেশে টিকে থাকে। ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের দেশের রাস্তা, নদী ও উপকূলীয় এলাকায় একটি সাধারণ দৃশ্য। এই বর্জ্য শুধু জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদেরই ক্ষতি করে না সঙ্গে অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কয়েক দশক ধরে প্লাস্টিক দূষণের সাথে লড়াই করছে। প্রকৃতপক্ষে প্লাস্টিক দূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। আমাদের পরিবেশ ও মানুষের ওপর এই সমস্যার বিধ্বংসী প্রভাব লক্ষণীয়। যখন প্লাস্টিক বর্জ্য পোড়ানো হয় তখন এটি বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত করে যা শ্বাসকষ্টসহ নানান স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক খাদ্য, পানি ও বাতাসের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। যা দীর্ঘমেয়াদে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)-এর তথ্য মতে, উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের মাত্র ৯ ভাগ পুনর্ব্যবহার করা হয়, ১২ ভাগ পুড়িয়ে ফেলা হয়, বাকি ৭৯ ভাগ পরিবেশে মিশে যায়। ১৯৫০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদিত ৯.২ বিলিয়ন টন প্লাস্টিকের মধ্যে প্রায় ৭ বিলিয়ন প্লাস্টিক বর্জ্যে পরিণত হয়, যা ভাগাড়ে জমা হয় বা ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন বেশিরভাগ প্লাস্টিক বর্জ্য এখনও পরিবেশে উপস্থিত রয়েছে। যা আমাদের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে।

প্রতি বছর আনুমানিক ৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে প্রবেশ করে। যা প্রতি মিনিটে এক ট্রাক প্লাস্টিক আবর্জনা সমুদ্রে ফেলার সমান। ২০১৮ সাল নাগাদ ১১৪ টিরও বেশি জলজ প্রজাতির শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে, যার মধ্যে কিছু প্রজাতি রয়েছে যা শুধু গভীরতম সমুদ্রে পাওয়া যায়। মাছ থেকে শুরু করে অন্যান্য লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক জীব প্রতি বছর প্লাস্টিকের কারণে মারা যায়। প্লাস্টিক আবর্জনা শুধু সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে না, খাদ্যশৃঙ্খল ও মানুষের জীবিকাকেও প্রভাবিত করে। এছাড়া প্লাস্টিক খেয়ে ফেলার কারণেও জলজ ও স্থলজ প্রাণীরা মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে।

প্লাস্টিক বর্জ্যকে প্রথমে নদী ও সমুদ্রে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখাই সমাধান। এটি উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অপ্রয়োজনীয় একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের (Single-use plastic) উৎপাদন হ্রাসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব। প্লাস্টিক দূষণের সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান হলো আমরা যে পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যবহার করি তা কমিয়ে আনা। প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যবহার সীমাবদ্ধকরণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে সরকারের ভূমিকা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও প্লাস্টিকের অনেক মূল্যবান ব্যবহার রয়েছে কিন্তু আশঙ্কার কথা হচ্ছে আমরা দিন দিন একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক পণ্যে আসক্ত হয়ে পড়েছি। যার পরিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত পরিণতি মারাত্মক। ইউএনইপি'র তথ্য মতে, বিশ্বজুড়ে প্রতি মিনিটে এক মিলিয়ন প্লাস্টিকের বোতল কেনা হয়। অন্যদিকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। মোট উৎপাদিত প্লাস্টিকের অর্ধেক একক-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি। যে-সব প্লাস্টিক পণ্য একবার ব্যবহারের পর আর কোনো কাজে লাগে না, সেগুলোই একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যা আমাদের দেশেও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

প্লাস্টিক দূষণ কমাতে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিসাইক্লিং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য উপাদান। পুনর্ব্যবহার করে আমরা প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে পারি। তবে সব প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা যায় না। তাই কী পুনর্ব্যবহার করা যায়, কী করা যায় না সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ও সঠিকভাবে পুনর্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এই দূষণরোধে একটি কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে।

* চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

প্লাস্টিক দূষণ কমাতে উদ্ভাবনও গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্যোক্তারা নতুন উপকরণ তৈরি ও প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছেন, যা প্লাস্টিককে প্রতিস্থাপন করতে পারে বা এটিকে আরও টেকসই করতে পারে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালে পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প 'সোনালী ব্যাগ' উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমেদ খান। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প হিসেবে বায়োডিগ্রেডেবল ও পরিবেশবান্ধব এই সোনালী ব্যাগের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এই উদ্ভাবনটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারলে প্লাস্টিক দূষণরোধে এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হবে।

প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচার, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করণ এবং সরকারের নীতিগত পরিবর্তন বাস্তবায়ন করে আমরা পরিবেশে মিশে যাওয়া প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে পারি। প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলা করে বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য আমাদের সকলের ভূমিকা পালন করার এখনই সময়।

প্রকৃতিতে প্রজাপতি

ড. মো: মনোয়ার হোসেন*

প্রজাপতি হচ্ছে একটি রঙিন পতঙ্গ, যা মূলত গাছের পরাগায়নে সাহায্যে করে। প্রজাপতি বনের ফুলে ফুলে ঘুরে মধু আহরণ করে ও সেই সাথে পরাগায়নের মাধ্যমে সবুজ বন ভূমিকেও টিকিয়া রাখে। সর্বপরি পরিবেশ বিপর্যয় রোধেও ভূমিকা রাখে। আমাদের আছে চিরসবুজ, পত্রমোচি ও ম্যানগ্রোভ বন। এই বন গুলোতে দেখতে পাওয়া যায় অনেক বেশি প্রজাপতি। যে বনে যত বেশি প্রজাপতি, সেই বন্ তত বেশি জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ। এই বনের গাছ, ফুল, ফল সব কিছু তৈরিতে আছে এই ছোট্ট পতঙ্গটির অবদান।

বর্তমানে এক সমীক্ষায় বাংলাদেশে প্রায় ৪২১ প্রজাতির প্রজাপতির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা বাংলাদেশে প্রায় ৫০০-এর অধিক প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। সারাবিশ্বে কয়েক সহস্রাধিক প্রজাতির প্রজাপতির উপস্থিতি বিদ্যমান। প্রজাপতি বেশি দেখা যায় ব্রাজিল, ইকুয়েডোর, কলম্বিয়ায় ও মেক্সিকোতে । আমাদের এশিয়া মহাদেশও বিশেষ করে ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় দেখা যায় অনেক বেশি বৈচিত্রের প্রজাপতি। বাংলাদেশও আছে অনেক বর্ণিল প্রজাপতি তন্মধ্যে, কমন ক্রো, প্লেইন টাইগার, লাইম সোয়ালটেইল, কমন মর্মন, ইভিনিং ব্রাউন, ডিঙ্গি বুশব্রাউন, এপফ্লাই, কমন ডাফার, পেইন্টেড লেডি, মটিলড ইমিগ্রান্ট, সিলভার লাইন, কমন সিরুলিওন, সানবিম, ফরগেট-মি-নট, কমন সার্জেন্ট, কমন পিরোট, কমান্ডার, ওয়ান্ডারার, কমন সেইলর, কমন রোজ, স্ট্রাইপড অ্যালবাট্রস, পিকক পানসি, লেওপার্ড লেইছউইং, কমন গ্রাস ইয়েলো ও সাইকি জাতের প্রজাপতি অন্যতম।

প্রজাপতির জীবন চক্রসহ, প্রজাপতির সার্বিক জীবনে আছে চমকপ্রদ ঘটনা। প্রজাপতির জীবন চক্রে আছে তার ডিম থেকে ক্যাটারপিলার ও পিউপা সহ পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির ধাপ । প্রজাপতি দেখতে পারে অতি বেগুনি রশ্মি (ইউভি লাইট) যা মানুষ পারেনা। তাই তাদের আছে রঙিন জগৎ ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি, যেখানে অনেকদূর থেকে তারা রংগিন ফুল ও পাতাকে সনাক্ত করার সামর্থ রাখে। প্রজাপতির পায়ে আছে রাসায়নিক সেন্সর, ফলে তারা পা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা খাবারকেও সনাক্ত করতে পারে। অপর দিকে তাদের পাখনা সনাক্ত করতে পারে বিষাক্ত ও দূষিত গ্যাস, ফলে এই ধরণের গ্যাস সনাক্তকরণ জ্ঞান, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদেরকে খাদ্য শৃঙ্খলে ব্যবহার ছাড়াও, তাদের রঙিন পাখানার স্কেল বায়ো-টেম্পলেট হিসেবে ব্যবহার করে সূর্যের আলো থেকে উৎপাদন করতে পারে সৌরবিদ্যুৎ। অপরদিকে প্রজাপতি পাহাড়ি ঝর্ণায় বা ছড়ায় পানি পান করে, খনিজ লবন সংগ্রহ করে যা পরবর্তীতে তাদের ডিম ফুটানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রজাপতির এই ধরণের আচরণ, পাডলিং নামে পরিচিত। এছাড়াও কোন কোন প্রজাপতি, বিশেষ করে মোনার্ক প্রজাপতি পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দল বেঁধে উড়ে চলে হাজার হাজার মাইল।

প্রজাপতি জন্ম ডিম থেকেই হয়, কিন্তু ডিম থেকে সরাসরি প্রজাপতি বের হয় না। প্রথমে শুঁয়োপোকা বা ক্যাটারপিলার (লার্ভা) বের হয়, তারপর সেই শুঁয়োপোকা এক সময় রূপান্তরিত হয় পিউপাতে, অতপর অনিন্দ্য সুন্দর প্রজাপতিতে। এই চারটি ধাপে প্রজাপতির জীবন চক্র শেষ হয়। তাপমাত্রা ভেদে, একটি পূর্ণ জীবন চক্রে ৩ থেকে ৫ সপ্তাহ লেগে যায়। এই নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতির জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হয় পোষক গাছ। যদিও পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি খায় ফুলের মধু, তদুপরি শুঁয়োপোকারা মূলত খায় গাছের পাতা। এই নির্দিষ্ট গাছ গুলো কে বলে পোষক গাছ (হোস্টপ্লান্ট)। এই হোস্টপ্লান্ট গুলো প্রজাপতি নির্দিষ্ট, আর তাই একটি প্রজাপতি একটি নির্দিষ্ট হোস্টপ্লান্টে ডিম পাড়ে। আমাদের দেশে অনেকের প্রজাপতি সম্পর্কে ধারণা থাকলেও, নেই প্রজাপতির হোস্টপ্লান্ট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা। আর তাই প্রজাপতি সংরক্ষণ-এর জন্য এই হোস্টপ্লান্ট সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা ও গবেষণা প্রয়োজন ।

প্রজাপতি টিকে থাকলে, পরিবেশ ভালো থাকবে, বেশি বেশি শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতিতে পরাগায়ন হবে। এর ফলে অনেক বেশি বীজ, ফল, শস্য ও গাছ উৎপন্ন হবে। ফলে সবুজ বন-ভূমি টিকে থাকার সাথে সাথে প্রকৃতিও পাবে অনেক বেশি অক্সিজেন। এই প্রজাপতি টিকে থাকলে, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ হবে, ফলে আমরা সকল ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা এগুলো মোকাবেলা করতে পারবো। সাধারনত বায়ু ও পানি দূষণ, প্রকৃতি ধ্বংস, দর্শনার্থীদের সৃষ্ট শব্দ দূষণ সহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ গুলো প্রতিনিয়ত প্রজাপতির জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। অপরপক্ষে বনভূমি উজাড় করার চলমান প্রক্রিয়াতে প্রকৃতির অপরূপ অলংকার প্রজাপতিকুল আজ অস্তিত্ব সংকটে। বনের লতাগুল্ম নষ্ট করলে প্রজাপতি তাদের প্রাকৃতিক বাসভূমি হারিয়ে ফেলে। আর তাই আজ তারা হুমকির সম্মুখীন। একারণে এদের সংরক্ষণ করতে হবে, তাদের আবাসস্থল, বন-জঙ্গল টিকিয়ে রাখতে হবে। এ জন্য দরকার সর্বস্তরের মানুষের গণসচেতনতা। এই গণসচেতনতা বৃদ্বির জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে প্রজাপতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতিতে প্রজাপতির ভূমিকা ও এর সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনে, গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই

* অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মূলত এই মেলার আয়োজন। দিনব্যাপি এমেলা সাজানো হয়- বর্ণাঢ্য র‍্যালি, শিশু-কিশোরদের জন্য প্রজাপতি বিষয়ক ছবি আঁকা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, পরিবেশ-প্রকৃতি এবং এর-সংরক্ষণ নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, প্রজাপতি বিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, প্রজাপতি পার্ক দর্শন (জীবন্ত প্রজাপতি ও হোস্টপ্লান্ট প্রদর্শন), অরিগামি, প্রজাপতি ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক ও প্রজাপতি চেনা প্রতিযোগিতা দিয়ে। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি। প্রকৃতি শুধু আহরণের জিনিস নয়। মানুষের দ্বারাই প্রকৃতি আজ বিধ্বস্ত। আর তাই প্রকৃতিকে বাঁচতে দিতে হবে।

প্রজাপতি এর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের উপর গবেষণা করার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজাপতি পার্ক ও গবেষণা কেন্দ্র। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে প্রজাপতির এই কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র। কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে শতকরা ৩৬ ভাগ ডিম, পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে পরিচর্যা, বংশবৃদ্ধি এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পর প্রকৃতিতে ছেড়ে দেয়া হয় বিভিন্ন সংকটাপন্ন প্রজাতির প্রজাপতি। প্রজাপতির পাশাপাশি, বিভিন্ন ধরণের হোস্ট প্লান্ট বিশেষ করে বাজনা, কলকাসুন্দা, ঈশ্বরমূল, কুর্চি, বৈচি, আকন্দ, পিপুলটি, আঙ্গুটি, রক্তফুল, বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, কুমারী লতা, ঝুমকো লতা ও আঙ্গুর লতার মতো গুল্ম প্রজাতির নানা ধরণের উদ্ভিদ আছে এই পার্কটিতে।

প্রজাপতি মিশে থাকে প্রকৃতির সাথে, পরিবেশের সাথে। আর তাই এই পরিবেশ ভালো না থাকলে প্রজাপতিরাও ভালো থাকবে না। আজ যেখানেই উন্নয়ন হচ্ছে সেখানেই কর্তন হচ্ছে বৃক্ষের, পরিষ্কার করা হচ্ছে বন-জঙ্গল। বনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রজাপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর তাই গাছ কাটা ও বন জঙ্গল ধ্বংস করতে দেয়া যাবে না। একটা বনের উপাদান যেমন নানা ধরণের বৃক্ষ, ঝোপঝাড়, গুল্ম-লতা ও বিভিন্ন প্রাণি, ঠিক তেমন একটি সুস্থ বনের নির্দেশিকা হলো প্রজাপতি। যে বনে যত বেশি প্রজাপতি থাকবে, সেই বন তত বেশি সুস্থ, তত বেশি গাছপালা ও জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য বনের ১০০ শতাংশ ভূমিতে ১০টি করে প্রজাপতি আবশ্যক। আর আমাদের এটির অনেক অভাব। এই ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা ও ভালোবাসা পারে এই অতি গুরুত্ব বহনকারি পরাগায়নে সাহায্যকারী পতঙ্গটির টিকে থাকা। তাই আমরা সবাই মিলে ভালোবাসি প্রকৃতি, এর অনুষঙ্গকে, গড়েতুলি একটি সুন্দর পরিবেশ- আগামী প্রজন্মের জন্য। যে প্রজন্ম হবে পরিবেশ বান্ধব, প্রজাপতি ও অন্যান্য জীববৈচিত্র সহ একটি সুন্দর সবুজাভ বাংলাদেশ গড়ার কারিগর।

লিওপার্ড লেইছউইং প্রজাপতি

হুআইট টাইগার প্রজাপতি

ক্যাটারপিলার (লিওপার্ড লেইছউইং)

ক্যাটারপিলার (লাইম সোয়ালটেইল)

ন্যাপ এক্সপো ২০২৪ আয়োজনঃ
বৈশ্বিক জলবায়ু অভিযোজন পথযাত্রায় বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন

মির্জা শওকত আলী, মোঃ মাহমুদ হোসেন, উম্মে সালমা সুমি*

ভূমিকা

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ' পুরস্কারজয়ী এবং বৈশ্বিক জলবায়ু নেগোসিয়েশনে অন্যতম বিশ্বনেতা হিসেবে সুপরিচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে গেছে। তাঁর উদ্যোগে এলডিসিভুক্ত দেশ হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা সম্মেলন (National Adaptation Plan Expo)-এর ৯ম আসর বাংলাদেশে বিগত ২২-২৫ এপ্রিল ২০২৪ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগতিক দেশ হিসেবে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে এত বড় পরিসরের জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন আয়োজন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার পথযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ন্যাপ এক্সপো

মেক্সিকোর কানকুন শহরে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কপ-১৬ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে (এলডিসি) জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে পেরুর লিমায় অনুষ্ঠিত কপ-২০ এর সিদ্ধান্তের আলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তাঁদের দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) প্রণয়ণের আহবান জানানো হয়।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ)-এর উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর অধীনে স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিশেষজ্ঞ গ্রুপ (LDC Expert Group-LEG) এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় অংশীজনদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য ন্যাপ এক্সপো আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ন্যাপ এক্সপো আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কর্তৃক ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলির ন্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত গ্যাপ এবং চাহিদা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়।

ন্যাপ এক্সপো আয়োজনের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ফোরাম হিসেবে ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া, যেখানে বিভিন্ন দেশ, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে। এই এক্সপো আয়োজনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো- (ক) ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিতে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক দিকগুলির উপর সর্বশেষ নির্দেশিকা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের আপডেট করা; (খ) বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম অনুশীলন, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, চাহিদা এবং ন্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রদত্ত এবং প্রাপ্ত সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে আলোচনা করা; এবং (গ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্ন দেশগুলোর ন্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য Green Climate Fund (GCF)-সহ আন্যান্য জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্ন দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম সম্পর্কিত পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রতিবছর ন্যাপ এক্সপো আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট নয়বার ন্যাপ এক্সপো আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে বিগত ২২-২৫ এপ্রিল ২০২৪ সময়ে ন্যাপ এক্সপো-এর ৯ম আসর আয়োজন করা হয়। কোনো এলডিসি-ভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রথমবার ন্যাপ এক্সপো আয়োজন করা হয়েছে।

*টেকনিক্যাল এক্সপার্ট-ফরেস্ট্রি, ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি ফরেস্ট্রি, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন

**অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপদেষ্টা, ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি ফরেস্ট্রি, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন

ন্যাপ এক্সপো-২০২৪-এর উদ্বোধন

"জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপান্তরমূলক অভিযোজন পরিচালনা" (Driving Transformational Adaptation through National Adaptation Plans)- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিগত ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) এক্সপো-২০২৪' এবং 'বাংলাদেশ জলবায়ু উন্নয়ন অংশীদারিত্ব (বিসিডিপি)' শীর্ষক চার দিনব্যাপী জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি, ইউএনএফসিসিসি-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সাইমন স্টিয়েল, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুয়েন লুইস বক্তব্য রাখেন। এ সম্মলনে বিশ্বের ১০৩টি দেশ থেকে ৩৮৪জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এছাড়াও ন্যাপ এক্সপো-২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞবৃন্দ, এনজিও-সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ন্যাপ এক্সপো ২০২৪-এর উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, "বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান ০.৪৮ শতাংশেরও কম হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থান ও শিল্পোন্নত দেশসমূহের মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে বাংলাদেশ জলবায়ুজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।" অনুষ্ঠানে জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসে আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে প্রধানমন্ত্রী ০৬ (ছয়) দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন:-

- প্রথমত, প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে তাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলোর দ্বারা জলবায়ু তহবিলে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি অভিযোজন ও প্রশমনের মধ্যে তা সমানভাবে বন্টন করতে হবে।

- তৃতীয়ত, উন্নত দেশগুলো কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি সবচেয়ে কার্যকর জ্বালানি সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

- চতুর্থত, নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে রূপান্তরের সময় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অগ্রাধিকারগুলো তাদের ক্ষতি অনুসারে বিবেচনা করতে হবে।

- পঞ্চমত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভাঙন, বন্যা এবং খরার কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সকল দেশকে ভাগ করে নিতে হবে।

- ষষ্ঠত, প্রধান অর্থনীতিসমূহকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশ সবসময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (বিসিডিপি) গঠন করা হয়েছে যেখানে সকল পক্ষ একমত হয়েছে। আমি আশা করি, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০, Nationally Determined Contribution (NDC), ২০২১ ও বাংলাদেশের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিডিপি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।" বর্তমানে বিশ্বে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, "এ যুদ্ধে অস্ত্র এবং অর্থ ব্যয় না করে, সে অর্থ যদি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রমে ব্যয় হতো, তবে আমাদের বিশ্বকে অনেকাংশে রক্ষা করা যেত।"

চারদিনব্যাপী আয়োজন

চারদিনব্যাপী আয়োজিত ন্যাপ এক্সপো-২০২৪-এ মোট ২৯টি সেশন, পার্টি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং ৪টি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনগুলিতে বিশেষজ্ঞরা Transformation Adaptation, Financial Mechanism, Adaptation Activity, Monitoring & Evaluation Tools, Gender Responsive Adaptation-সহ বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ন্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত গ্যাপসমূহ মোকাবেলায় এ এক্সপোতে মোট ৭টি প্রশিক্ষণ সেশনও আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি এবং ইউএনএফসিসিসি-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সাইমন স্টিয়েল-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ (High Level Dialogue) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপে এ পর্যন্ত মাত্র ৫৫টি দেশ কর্তৃক NAP প্রণীত হয়েছে উল্লেখ করে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে NAP প্রণয়নের তাগিদ প্রদান করেন। পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি NAP বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন নিশ্চিতের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এই সম্মেলনে ২৩টি স্টলে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। জলবায়ু অভিযোজন বিষয়গুলো প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের জন্য ১৩টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ তার উদ্ভাবনী অভিযোজন ব্যবস্থা যেমন: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পার্বত্য অঞ্চলে সৌরশক্তিচালিত পানি আহরণ, জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি এবং ঘূর্ণিঝড়, আশ্রয়কেন্দ্র ও রাস্তার কাজের মতো অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রদর্শন করে। এসব স্টলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অংশ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীও অংশ নেয়। সম্মেলনে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অতিথিদের সামনে তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্টলে পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালিত দেশের বিভিন্ন অভিযোজনমূলক কার্যক্রম এবং সফল উদ্যোগ তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি সেশনসমূহ

চারদিনব্যাপী আয়োজিত ন্যাপ এক্সপো ২০২৪-এ স্বাগতিক বাংলাদেশের পক্ষে নিম্নোক্ত তিনটি কারিগরি সেশন আয়োজন করা হয়:

১। **এডভান্সমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্লাইমেট প্লানস অফ বাংলাদেশ** (Advancement of National Climate Plans of Bangladesh): বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে এ সেশনে বাংলাদেশের উদ্যোগ

এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় চিহ্নিত ১১টি জলবায়ু সঙ্কটাপূর্ণ এলাকাতে ৮টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের জন্য মোট ১১৩টি অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম (Interventions) চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ২৭ বছরে অর্থাৎ ২০৫০ সাল পর্যন্ত সময়ে ন্যাপ-এ গৃহীত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে প্রায় ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে।

ন্যাপ এক্সপো-তে স্বাগতিক বাংলাদেশ আয়োজিত
Advancement of National Climate Plans of Bangladesh-শীর্ষক কারিগরি সেশন

২। **মবিলাইজিং ডমেস্টিক ক্লাইমেট ফাইনান্স:** এক্সপেরিয়েন্স অফ বাংলাদেশ (Mobilizing Domestic Climate Finance: Experience of Bangladesh): জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অভিজ্ঞতা বিনিময়ে এ সেশনটি আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে জলবায়ুসহিষ্ণুতা দিকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে নিজস্ব অর্থায়নে এ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করে এ পর্যন্ত এই তহবিলে ৩৯৬৯.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ৯৬৯টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সামুদ্রিক বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার, জলবায়ুসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং উপকূলীয় বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা অর্জনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

৩। **বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (Bangladesh Climate Development Partnership):** সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (বিসিডিপি)-এর উপর এ সেশনটি আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০-এ বর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং NDC-তে বর্ণিত অগ্রাধিকারগুলি বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১৭৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন। এই সেশনটি আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য সুযোগ ও ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হয়।

উপসংহার

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে টানা ১০-১৫ দিনের মতো তীব্র তাপপ্রবাহে যখন জনজীবন অতিষ্ঠ এবং বাংলাদেশে যখন বিগত ৫০ বছরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়, ঠিক সে সময়ে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এ ন্যাপ এক্সপো-২০২৪। এ রকম পরিস্থিতিতে ন্যাপ এক্সপো-২০২৪ আয়োজনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর অভিযোজন এবং প্রশমনের ক্ষেত্রে জলবায়ু বিপদাপন্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরি সহযোগীতার যৌক্তিকতা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে তুলে ধরা হয়। এই এক্সপো আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিজেদের সক্ষমতা, শক্তি ও পরিকল্পনা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় NAP বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এই ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা ভয়াবহ, সেই বার্তাও বিশ্ব দরবারে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। আশা করা যাচ্ছে, আসন্ন কপ-২৯-এ উন্নত দেশগুলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন ২০১৯ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করা, ইউএনএফসিসিসি-এর লস এন্ড ড্যামেজ তহবিল হতে অর্থ প্রাপ্তিসহ সকল যৌক্তিক দাবিসমূহের বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে ন্যাপ এক্সপো-২০২৪ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সাম্প্রতিক ভূমিকম্প, ভূ-তাত্ত্বিক কারণ ও করণীয়

মোহাম্মদ এমরান হোসেন *

ভূমিকা

ভূমিকম্প মানব সভ্যতার অন্যতম ভয়ানক এক প্রাকৃতিক দূর্যোগ। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের পুরো সভ্যতা দন্ডায়মান, সেই জমিন যখন ওলট-পালট হয়ে যায় এর থেকে ভয়ের আর কিছু থাকতে পারেনা। আজকাল হরহামেশা কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগছে, যেমন: মাঝে-মধ্যেই আমাদের দেশ বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকাবাসীরা প্রায়শই স্বল্পস্থায়ী ভূমিকম্প টের পাচ্ছে কেন? ভূমিকম্পের কার্যকারণ কী? ভূমিকম্প কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় বা আদৌ যায় কি না? ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি দেওয়া সম্ভব? ইত্যাদি। বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও ভূমিকম্পের মারাত্মক সব ধ্বংসের খবরা খবর আমরা পাচ্ছি। অতিমারি করোনার মধ্যেই গত ২৯ ও ৩০ মে ২০২১ সিলেট শহর ও আশপাশের এলাকায় ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে ঘন-ঘন কয়েকটি ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে উক্ত ভূমিকম্পের মাত্রা ছিলো ৪.১। পরবর্তীতে ৭ জুন সিলেট শহরে মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প হয়। তখন সিলেট শহরের মানুষ ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় ছুটে এসেছিলো। সিলেট শহরের দুটি ছয়তলা ভবন হেলে পড়ে এবং সিলেট অঞ্চলসহ সমগ্র দেশজুড়ে মানুষের মনে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি বিরাজ করে। এছাড়াও গত ৭ জুলাই সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে পুনরায় মাঝারি মাত্রার আরো দু'টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। গত ০৮/০৮/২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম ও আশেপাশের এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং গত ১০/০৮/২০২১ তারিখে মায়ানমারে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সাম্প্রতিক অতীতে ২০২০ সালের ২১ জুন ৫.১ মাত্রা, ২২ জুন ৫.৮ মাত্রা এবং ০৩ নভেম্বর ৪.৪ মাত্রার মোট ৩টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ছোট ছোট মাত্রার ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Epicenter) সিলেট শহরের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিলো। যেকোন ভূমিকম্পের উৎসস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে, যা নিয়ে সচেতন মহল শংকিত।

ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ও ভূমিকম্পের কারণ

সহজ কথায় পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ কেপে ওঠাকে ভূমিকম্প বলে। ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরে আন্দোলনের ফলে ভূ-পৃষ্টে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী, ভূমিকম্প হয় প্লেট টেকটোনিকের (Plate Tectonic) সংঘর্ষের ফলে। পাশাপাশি দুটি মহাদেশীয় প্লেটের সীমান্ত অঞ্চলে যে প্রবল পীড়নের (Stress/Oppression) সৃষ্টি হয়, সেই পীড়ন যখন বড়-সড় চ্যুতির (Fault) সৃষ্টি করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি বের করে দেয় তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের মূল প্রকৃতি জানতে হলে পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। পৃথিবীর তৈরী ও গঠন সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য হলো: ১) Plate Tectonic Theory ও ২) Continental Drift Theory। ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাকৃতিক, পৌরণিক ও মারফতি কারণ। তাছাড়াও মানবসৃষ্ট কারণেও ভূমিকম্প হতে পারে। উক্ত কারণসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো:

প্রাকৃতিক কারণসমূহ:

ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি গভীরতায় বড় মাত্রার বিস্ফোরণ (নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ, গ্যাস অনুসন্ধানকারী কূপে বিস্ফোরণ, খনিতে বিস্ফোরণ ইত্যাদি) ঘটলে মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। তাছাড়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও অগ্নুৎপাতের সময় সাধারণত ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। আগ্নেয় বলয়/ আগ্নেয় বলয়ের কাছাকাছি এলাকায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি বেশী থাকে।

প্রায় এক ডজন ছোট-বড় অংশ নিয়ে ভূ-ত্বক গঠিত। এই অংশগুলোকে প্লেট টেকটনিক (Plate Tectonic) বলে। এই প্লেটগুলো নিচের অশক্ত ম্যান্টলের উপর ভাসতে থাকে এবং প্লেটগুলো একে অপরের সাথে ঘষা খেতে থাকে, কখনো একটি প্লেট অপরটির উপরে উঠে যায় যাকে কিংবা নিচে চলে যায় যাকে অধোঃ গামী অঞ্চল (Subduction Zone) বলে। কোথাও আবার একে অপর থেকে দুরে সরে যায় যাকে অপসারী অঞ্চল (Spreading Zone) বলে। আবার যখন দুটি প্লেট পরস্পরের গা ঘেঁষে যায় তখন সেখানে পরবর্তী চ্যুতি (Transform Fault) তৈরী হয়। এই চ্যুতি থেকে ভূমিকম্প হওয়া স্বাভাবিক।

* পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট

মানবসৃষ্ট কারণসমূহ

মানবসৃষ্ট অনেক কারণে কোন কোন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো: ১) জলাধার নির্মাণ, ২) পারমানবিক পরীক্ষা, ৩) খনিজ উত্তোলন ইত্যাদি। কোন স্থানে অতিরিক্ত খনিজ (গ্যাস, তেল ইত্যাদি) উত্তোলনের কারণে শিলার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে ধ্বংসের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প দেখা দিতে পারে। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় খনিজ উত্তোলনের কারণে নিউক্যাসল ভূমিকম্প এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পৌরণিক কারণসমূহ

নর্স পুরাণ অনুসারে দেবতা বলডারকে হত্যার কারণে দেবতা লকিকে গুহায় শিকলবন্দী করে রাখা হয়েছে। লকির মাথায় এক বিষধর সাপ। সেই সাপ একটু পরপর লকির মাথা লক্ষ্য করে বিষ ঢালে। বিষের হা থেকে লকিকে বাঁচাতে পাশে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী সেজিন (Sigyn) তা একটা পাত্রে সংগ্রহ করে। পাত্রটা ভরে এলে সেজিন বিষটুকু মাটিতে ফেলে দিয়ে পাত্র খালি করে। পাত্রটা খালি করার সময় বিষের হা থেকে নিজের মুখমন্ডলকে বাঁচাতে লকি ভয়ানকভাবে নড়াচড়া করে। ফলে শিকলের টানাটানির কারণে পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

গ্রিক পুরাণ অনুসারে পাতাল দেবতা পসাইডনের (Poseidon) মেজাজ-মর্জি খারাপ থাকলে সে হাতে ধরা ত্রিশূল দিয়ে মাটিতে সজোরে আঘাত করে। তখন ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়।

জাপানি উপকথা অনুসারে নামাজু (Namazu) নামের বিশাল মাগুর মাছ মাটির গভীরে কাদার ভেতর বাস করে। নামাজুকে পাহারা দিয়ে রেখেছে দেবতা কাসিমা। কাসিমা যখন কাজে ফাঁকি দেয় তখন নামাজু পালাবার জন্য ঝাপটাঝাপটি করে। নামাজুর ঝাপটাঝাপটির ফলাফলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়।

মারফতি কারণসমূহ

ছেলেবেলায় গ্রামের মুরুব্বিদের মুখে শোনা গল্প থেকে জানা যায়, প্লেটের মতো চ্যাপ্টা পৃথিবীকে একটা গরু তার শিংয়ের উপর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরুটা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে পৃথিবীকে এক শিং থেকে অন্য শিংয়ে স্থানান্তর করে। স্থানান্তরের সময় যে ঝাঁকুনি হয় সেটাই ভূমিকম্প।

ভূ-চ্যুতি (Fault Line)

ভূ-আন্দোলন বা Tectonic Movement এর কারণে এক শিলাস্তর যদি পাশ্ববর্তী শিলাস্তর থেকে ওপরে-নিচে সরে যায়, ভূ-চ্যুতি সৃষ্টি হয়। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশের আশেপাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি চ্যুতি রেখা বা Fault Line গেছে। আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দুটি বড় ভূ-চ্যুতি রয়েছে, যা এ অঞ্চলের ভূমিকম্পের মূল কারণ।

শক-ওয়েভ (Shock Wave)

ভূমিকম্পের ডাক নাম শক। ভূমিকম্পের ফলে যেসব তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের সবগুলোকে শকওয়েভ (Shock Wave) বলে। সাধারণত বড় ভূমিকম্পের অব্যবহিত আগে পরে অপেক্ষাকৃত ছোট মাত্রার এক বা একাধিক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এদের যথাক্রমে ফোরশক (Fore Shock) ও আফটার শক (After Shock) এবং মূল ভূমিকম্পটিকে মেইন শক (Main Shock) বলে। এ ধরণের শক সাধারণত তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক ধরণের তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে যায়, অন্যটি পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়ে ছড়িয়ে যায়। উভয় প্রকার তরঙ্গই আবার দুই প্রকার, কম্প্রেশনাল তরঙ্গ (Compressional Wave) ও শিয়ার তরঙ্গ (Shear Wave)। কম্প্রেশনাল তরঙ্গ সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এগোয়, শিয়ার এগোয় ওপর-নিচ দুলতে দুলতে। যেহেতু কম্প্রেশনাল তরঙ্গের দ্রুতি বেশি, তাই এটি আগে অনুভূত হয়। একে প্রাইমারি তরঙ্গ (Primary Wave) বা পি-ওয়েভ (P-Wave) এবং অন্যটিকে সেকেন্ডারি তরঙ্গ (Secondary Wave) বা এস ওয়েভ (S-Wave) বলে। S-Wave তার সামনে সকল কিছুকে আড়াআড়ি আঘাত করে, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের যা কিছু আছে তারা ওপর-নিচ করতে থাকে। ভূমিকম্পের আগমন বার্তা শোনা যায় পি-তরঙ্গ (P-Wave) থেকে। ফোর শক বা আফটার শক মূল ভূমিকম্প সংঘটিত হবার কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে কয়েকদিন আগে/পরে সংঘটিত হতে পারে। এ কারণে অনেক সময় ফোর শক থেকে মেইন শক আসার ইঙ্গিত বোঝা যায়।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল (Epicenter)

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেখান থেকে ভূ-কম্প তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার সোজা উপরের ভূ-পৃষ্ঠস্থলকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা এপিসেন্টার বলে। এই কেন্দ্র থেকে কম্পন ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের মাধ্যমে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র প্রায়শঃ চ্যুতিরেখা অংশে অবস্থান করে থাকে। সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে এই কেন্দ্র অবস্থান করে থাকে। এপিসেন্টারের কাছাকাছি এলাকায় ভূমিকম্পের তীব্রতা দূরের যেকোন স্থানের চেয়ে বেশী অনুভূত হয়।

রিখটার স্কেলের পার্থক্যের সাথে ভূমিকম্পের ভয়াবহতার পার্থক্য

কোন ভূমিকম্প সাইজমোগ্রামে কত বড় বিস্তারের তরঙ্গ তৈরি করে তার উপর ভিত্তি করে ১৯৩৫ সালে ক্যালটেকের ভূমিকম্পবিদ ড. চার্লস রিকটার লগারিদমিক স্কেলের সাহায্যে ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তার নাম রিকটার স্কেল। কোন রেকর্ডিং স্টেশন থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সংগঠিত রিখটার স্কেলে ১ মাত্রার ভূমিকম্পে S-Wave এর সর্বোচ্চ বিস্তার (ধরা যাক ৫ মিমি), যা ২ মাত্রার ভূমিকম্পে তার দশ গুণ বেশি হবে (৫০ মিমি)।

আবার P-Wave এর তুলনায় S-Wave এর গতিবেগ কম। তাই যেকোন সাইজমোগ্রাম থেকে প্রথম P-Wave এবং প্রথম S-Wave এর আগমনী সময়ের পার্থক্যকে তাদের গতিবেগের পার্থক্য দিয়ে গুণ করে রেকর্ডিং স্টেশন থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের দূরত বের করা সম্ভব। এদিকে সাইজমোগ্রাম থেকে S-Wave এর সর্বোচ্চ বিস্তার মেপে নেয়া যাচ্ছে। দূরত্ব ও বিস্তার জানা থাকলে সহজেই ভূমিকম্পের মাত্রা রিকটার স্কেলে বের করা সম্ভব। শক্তিমত্তার পার্থক্যে ১ মাত্রার ভূমিকম্পের তুলনায় ২ মাত্রার ভূমিকম্প প্রায় ৩২ গুণ বড়।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও টেকটোনিক প্লেট এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ভূমিকম্প

প্লেট টেকটোনিক হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। টেকটোনিক প্লেট হলো সেই ব্লক বা টুকরো যা লিথোস্ফিয়ারে (Lithosphere) বিভক্ত থাকে। এটি পৃথিবীর আচ্ছাদন দ্বারা টেনে নিয়ে যায়। টেকটোনিক প্লেটগুলির সংঘর্ষ এবং বিশেষত রূপান্তর সীমাটি ভূমিকম্পের আন্দোলন বা ভূমিকম্পের কারণ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু বিশাল মাত্রায় পৌঁছে এবং নেতিবাচকভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, অবকাঠামো ধ্বংস করে এবং মানুষের মৃত্যু ঘটায়। যখন ভূমিকম্পের আন্দোলন সমুদ্রের মধ্যে ঘটে এবং উচ্চ জলোচ্ছাস সংঘটিত হয়; এই ঘটনার পরিণতির মধ্যে রয়েছে সুনামি (Tsunami)।

প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও তার ব্যত্যয় হয় না। ভূ-আন্দোলন বা Tectonic Movement এর কারণে এক শিলাস্তর যদি পাশ্ববর্তী শিলাস্তর থেকে ওপরে-নিচে সরে যায়, ভূ-চ্যুতি সৃষ্টি হয়। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশের আশেপাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি চ্যুতি রেখা বা Fault Line গেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দুটি বড় ভূ-চ্যুতি রয়েছে, যা এ অঞ্চলের ভূমিকম্পের মূল কারণ। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য একটি উচ্চ ঝুঁকির অঞ্চলে অবস্থিত।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়'র পর্যবেক্ষণাগারে ২০০৬ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৯ সালের মে মাসের মধ্যে ৪ মাত্রার উপরে মোট ৮৬টি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। এই ছোটখাটো কম্পনগুলো ভারী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বাংলাদেশ মূলত ভারত ও মায়ানমারের ভূ-অভ্যন্তরের দুটি ভূ-চ্যুতির (Fault Lines) প্রভাবে আন্দোলিত হয়। উল্লেখ্য, ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ মূলত ভারতীয়, ইউরেশীয় এবং মায়ানমারের টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে অবস্থান করছে। ভারতীয় ও ইউরেশীয় প্লেট দুটি দীর্ঘদিন যাবৎ হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে। অপেক্ষা করছে বড় ধরণের নড়াচড়ার বা বড় ধরণের ভূ-কম্পনের। তাছাড়া পৃথিবীর মোট ১১টি প্লেটের মধ্যে ৭ নম্বর প্লেটটি মেঘালয়-মিয়ানমার-পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে মিয়ানমারের কাছেই সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্লেটটি আরেকটি প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে একটি চ্যুতি (রাখাইন চ্যুতি) তৈরি হচ্ছে, যা থেকে ১.৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে ৮টি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা (Fault Zone) সচল অবস্থায় রয়েছে। বৃহত্তর সিলেটের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হালুয়াঘাট চ্যুতির ডাউকী চ্যুতি অংশ ও শাহজীবাজার চ্যুতি (আংশিক ডাউকি চ্যুতি) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের নিচে জমে ওঠা টেকটোনিক প্লেটের চাপ বিগত ৪০০ বছর ধরে জমে আছে। এই চাপ যখন মুক্ত হবে তখন সৃষ্ট ভূমিকম্পের মাত্রা দাঁড়াবে প্রায় ৮.২ রিকটার। এমনকি তা ৯ রিখটারেও পৌছাতে পারে। এরকম ঘটনা ঘটলে প্রায় কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ভূমিকম্পের তীব্রতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ৩টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্র, অঞ্চলভিত্তিক জেলাসমূহ ও **ভূ-কম্পনের মাত্রা নিম্নরূপঃ**

জোন-১ সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম অঞ্চল (ভূ-কম্পনীয় দিক থেকে সর্বাধিক সক্রিয়)

জোন-২ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বগুড়া, পঞ্চগড় অঞ্চল

(ভূ-কম্পনীয় দিক থেকে মাঝারি সক্রিয়) ও

জোন-৩ খুলনা, যশোর, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল

(ভূ-কম্পনীয় দিক থেকে কম সক্রিয়)

বুয়েট গবেষকদের প্রস্তুতকৃত ভূ-কম্পন এলাকাভিত্তিক এ মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা ভূমিকম্পের উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে, ৪১% মধ্যম মাত্রার ঝুঁকিতে এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্পজনিত কারণে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মুখে। কারণ, সিলেট-সুনামগঞ্জ ও ভারতের শিলংকে বিভক্ত করেছে ডাউকী নদী আর ডাউকী নদী ডাউকী চ্যুতি (Dauki Fault) বরাবর অবস্থান করছে। আর ভূতাত্ত্বিক চ্যুতিগুলোই বড় ধরণের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। সিলেটের সীমান্তবর্তী এ ধরণের চ্যুতিগুলোর কোন কোনটিতে Sub down Fault রয়েছে, যেগুলো ভূমিকম্প ঘটলে পাথারিয়া অর্ন্তচ্যুতি (Patharia Anticline) নিচের দিকে মোড় নিতে পারে, ফলে বড়লেখার পাথারিয়া পাহাড় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ পরিচালিত Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban areas against Seismic Disaster (Radios) জরিপে ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্বের ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকাও অন্যতম। ২০১০ সালে জাপানের Tokyo Institute of Technology (TIT) এর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, ঢাকা ও সিলেটের সম্প্রসারিত অংশে জলাশয় ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে অনেক আবাসিক এলাকা। ভূমিকম্পের সময় নরম মাটি ও ভরাট করা এলাকার মাটি ভূমিকম্পের কম্পন তরঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে ভূমিকম্পের তীব্রতা বাড়ে। গবেষকরা তাই ঢাকার বর্ধিতাংশের আলগা মাটি সমৃদ্ধ জনবসতিকে যতেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। ভূতাত্ত্বিক অবস্থান এবং মানবিক ও অর্থনৈতিক এক্সপোজারের কারণে ঢাকা ভূমিকম্পের বেশি ঝুঁকিতে অবস্থিত। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংমনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী এবং সিলেটের মতো বড় জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে।

ভূ-তাত্ত্বিকদের অভিমত, বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে F1, F2, F3 I F4 নামে ৪টি ভূকম্পন উৎস রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিই ৭-৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে এবং যেকোন সময় ভূমিকম্প তৈরি করে সুনামি ঘটতে পারে, যা ভূমিকম্প ঘটার মাত্র ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে সুনামি বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। উল্লেখ্য, ১৭৬২ সালে সুমাত্রা সমুদ্র তলে সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিলো এবং তৎসময়ে সৃষ্ট ফাটলটি এখনো সক্রিয় রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বাংলাদেশের উপকূলে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত চ্যুতি এলাকার ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি আঘাত হানলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, বাগেরহাট, খুলনা, বরিশাল ও সাতক্ষীরার কয়েকশত কিলোমিটার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা করা হয়।

সাধারণত বড় মাত্রার ভূমিকম্পগুলোর পুনরাবৃত্তির সময়কাল বেশ বড় হয়। বাংলাদেশ তথা বেঙ্গল বেসিনের ক্ষেত্রে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তির সময়কাল প্রায় ৩৫০ বছর। এ কারণে বড়মাত্রার ভূমিকম্পগুলোর পুনরাবৃত্তির সময়কাল, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতার গণিত ব্যবহার করে বের করতে গেলে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন, যা খুবই অপ্রতুল। বেঙ্গল বেসিনে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তির সময়কাল ঠিকঠাকভাবে হিসাব করতে গেলে কমপক্ষে ১ হাজার বছরের তথ্য জানা দরকার। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী বেঙ্গল বেসিনে প্রতি ৩৫০ বছর বা কাছাকাছি সময় পর পর একটা করে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালে দুটো ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৮৯৭ সালে ৮.১ মাত্রার গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্পের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। এ সময় অবিভক্ত আসামের কামরূপ, সোরালপাড়া, দবং, নওগা এবং মেঘালয়ের শিলং ও বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিস্তির্ণ এলাকাকে বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলিতে প্রতি ১০০ বছর পর-পর সাধারণত ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারী গুজরাটের আহমেদাবাদ ও ভুজসহ এক বিস্তির্ণ অঞ্চলে প্রলয়কারী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ড. সোমিত্র মুখার্জী আইআরএম-১সি স্যাটেলাইট থেকে দূরসংবেদী তথ্য বিশ্লেষণ করে গুজরাটের কোংকন কেরল ও উত্তরাঞ্চলে এক প্রলয়কারী ভূমিকম্পের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জানান, গুজরাটের ভূমিকম্পের মূলেই হচ্ছে ঐ রাজ্যে ১৯৯৯ সালে ঘটে যাওয়া ব্যাপক খরা। তবে এসবই হচ্ছে অনুমান নির্ভর।

চীন ও তুরস্কের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বড় মাত্রার ভূমিকম্পগুলো ক্লাস্টার হিসাবে সংঘটিত হয়। তবে, আমরা জানি ভূমিকম্প উৎপত্তির পেছনে শিলাস্তরের বিচ্যুতি (displacement) দায়ী। তাই অ্যাকটিভ ফল্টে (সান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্ট) বিচ্যুতির পরিমাণ হিসাব করে ভূমিকম্প সংঘটিত হবার সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য মাত্রা নিরূপণ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে বিচ্যুতির পরিমাণ সঠিকভাবে বের করতে রেডিও কার্বন ডেটিং জানা দরকার। যা নির্ণয় করা সময় সাপেক্ষ ও জটিল।

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম

ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিকম্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনভূক্ত এলাকায় ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমকম্পনসহ সকল দূর্যোগের সময় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের করণীয় নির্ধারণ করে 'দূর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১৯ (Standing Orders on Disaster, 2019)' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অধীন দূর্যোগকালীন সময়ে কার কী করণীয় তা নিরূপন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) গঠন করা হয়েছে। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীর অধীন মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যন্ত অংশীজনের করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিকন্তু, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয়ে জরুরী প্রতিক্রিয়া সংস্থাগুলোর জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) অনুমোদন লাভ করেছে। ইতোমধ্যে ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue) সরঞ্জাম ক্রয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিস্তারিত জনসচেতনতা কর্মসূচী অবশ্যই নিয়মিতভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে নগরবাসী, সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ), রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট, আবাসন ব্যবসায়ী, চিকিৎসকসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা গেলে ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ ভূমিকম্প পরবর্তী কাজ ত্বরান্বিত করা সহজ হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue)। এজন্য বাংলাদেশের বড় বড় শহর বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের গলি/পাড়ার রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা প্রয়োজন, যাতে যে কোন দূর্যোগে Search and Rescue সহজেই করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

বাস্তব দুনিয়ায় লক্ষ-কোটি ব্লকের আদি অবস্থা, তাদের মধ্যে সঞ্চিত পীড়নের পরিমাণ, তাদের গঠন-ঘনত্ব-সান্দ্রতা-স্থিতিস্থাপকতা কিছুই জানা যায়না। সেজন্য ভূমিকম্পের কোন ভবিষ্যদ্বানী আজও জানা সম্ভব হয়নি। বেঙ্গল বেসিন বা বাংলাদেশের টেকটোনিক অবস্থানের কারণে এখানে নিয়মিত বিরতিতে মাঝারি থেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প হবেই। ঢাকাসহ সারা দেশের অপরিকল্পিত নগরায়ন, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতার অপ্রতলুতা ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়ার কোনো প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সচেতনতাই আমাদের একমাত্র সমাধান। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গণ মোকাবেলায় বিশ্বে রোল মডেল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভূমিকম্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ তার সক্ষমতা প্রমান করবে সেটাই প্রত্যাশা। যদিও এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অদ্যাবধি সীমিত। ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস এবং প্রতিরোধ করা অতীতের মতো নিকট ভবিষ্যতেও সম্ভব হয়ে উঠবেনা। তবে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় যে দিকচিহ্ন বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন অদ্যাবধি সে চিহ্নরেখার অভ্যন্তরেই ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে অনুমেয়। তৎপ্রেক্ষিতে ভূমিকম্পের কবল থেকে কিভাবে জনজীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়, সে ব্যাপারে আরো তৎপর হতে হবে। মর্মান্তিক এক পরিনতির আশংকায় ভীতির সঙ্গে বসবাসের চেয়ে কঠিন সময় কঠিনতম দৃঢ়তায় মোকাবেলা করার প্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া

মো: সামসুজ্জামান সরকার *

- পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে সরকার ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারী করে যা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995) নামে অভিহিত।

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইনের ২০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (Environment Conservation Rules, 1997) জারী করে। পরবর্তীকালে, সরকার ২০২৩ সালের ৫ মাচ তারিখে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে সম্পুণ নতুনভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ (Environment Conservation Rules, 2023) জারী করে।

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২(১) ধারা মোতাবেক মহাপরিচালকের নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫ এ অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কাযক্রমের ব্যপ্তি ও তা থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ-কে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে -

  ১. সবুজ

  ২. হলুদ

  ৩. কমলা

  ৪. লাল

- সকল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র, সাধারণ তথ্যাবলী, লোকেশন ম্যাপ, লে-আউট প্ল্যান, ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি (সবুজ শ্রেণির ক্ষেত্রে ছাড়পত্র ফি) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। তবে, যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ সরাসরি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ সরাসরি সদর দপ্তরে আবেদন করতে হবে।

- হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তবে সবুজ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

- সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ছাড়পত্র ফি জমা প্রদান করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করবে; অথবা আবেদনকারী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের অযোগ্য হলে তার আবেদনটি নামঞ্জুর করে তার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির ৮(আট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও

* উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করবে। আবেদনকারী প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে। দাখিলকৃত আবেদনে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট না হলে আবেদনটি নামঞ্জুর করে তার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর হলুদ শেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে তা চালু করবার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন, ইত্যাদি বিবেচনা করে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করবে, অথবা সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করে তার কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হতে ক্রমিক নং ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষট্টি) হতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে ও তার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করবে। আবেদন দাখিলের অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে: তবে আবেদন নামঞ্জুর করা হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করবার উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা আবেদন নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং অনুযায়ী আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের অথবা প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আবেদন দাখিলের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে: তবে, আবেদন নামঞ্জুর করা হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট কমলা শ্রেণির কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে তাহলে কমিটি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করতে পারবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক উক্ত সুপারিশ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

- লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, তফসিল-১০ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) দাখিল করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে ও তার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ

করবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে। মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধির (ঃবৎসং ড়ভ ৎবভবৎবহপব) অনুমোদন প্রদান করা হবে। তবে, সার্বিক দিক পর্যালোচনাক্রমে আবেদনটি নামঞ্জুর করা হলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকগণ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদন ও এই প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তফসিল-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন।

- লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের বিষয় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জনমত যাচাইয়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন ও এতদসংশ্লিষ্ট বাংলা সারসংক্ষেপের ৩ (তিন) টি সেটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে এবং তার অনুলিপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা জনমত যাচাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে বহুল প্রচারিত একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন । জনমত যাচাই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রচার করতে হবে। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে মতামত প্রদান করা যাবে। তবে, খসড়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জনমত যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। জনমত যাচাই এর জন্য সভা আয়োজনের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করতে হবে। অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি, লাল শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন করতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য আহ্বান করবে। ফি জমা প্রদানের প্রমাণক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিলের অনধিক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদনের উপর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কোনো আপত্তি থাকলে তা অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, লেটারস্ অব ক্রেডিট (এল,সি) খোলাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারবে।

- অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সুপারিশসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাক্রমে অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করে তার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট অভিমতসহ সুপারিশ প্রদান করবে। প্রাপ্ত সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নিকট হতে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রাপ্তির ৩০

(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশত ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে। তবে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুর করা হলে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

- সবুজ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ৫ বছর, হলুদ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ২ বছর এবং কমলা ও লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ১ বছর। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ দিন পুর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হয়।

- শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রবিশেষে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত অপসারণ নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

- **এক নজরে ছাড়পত্র প্রদানের সময়সীমা :**

শ্রেণী	ছাড়পত্রের ধরণ	সময়সীমা (কার্যদিবস)
সবুজ	পরিবেশগত	০৭
হলুদ	অবস্থানগত	১৫
হলুদ	পরিবেশগত	০৭
কমলা	অবস্থানগত	২১
কমলা	পরিবেশগত	২০
লাল	ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন	৩০
লাল	অবস্থানগত	৩০
লাল	পরিবেশগত	৩০

- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ছাড়পত্র নবায়ন ফি:
  পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল ৭ অনুসারে

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড		অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য
১	২	৩	৪	৫
পরিবেশ অধিদপ্তর		বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
১৪৫০৩	১৪২২৩১৯			
		(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ পর্যন্ত	৩,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ ১(এক) হইতে ১০ (দশ) লক্ষ পর্যন্ত	৬,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(গ) ১০ (দশ) লক্ষ ১(এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ পর্যন্ত	১০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ ১(এক) হইতে ১ (এক) কোটি পর্যন্ত	২০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঙ) ১ (এক) কোটি ১(এক) হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(চ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১(এক) হইতে ২০ (বিশ) কোটি পর্যন্ত	৮০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ছ) ২০ (বিশ) কোটি ১(এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি পর্যন্ত	১,৬০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড		অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য
১	২	৩	৪	৫
পরিবেশ অধিদপ্তর		বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
১৪৫০৩	১৪২২৩১৯			
		(জ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি ১(এক) হইতে ১০০ (একশত) কোটি পর্যন্ত	২,৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঝ) ১০০ (একশত) কোটি ১(এক) হইতে ২০০ (দুইশত) কোটি পর্যন্ত	৪,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঞ) ২০০ (দুইশত) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি পর্যন্ত	৬,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ট) ৫০০ (পাঁচশত) কোটি ১(এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি পর্যন্ত	৮,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঠ) ১০০০ (এক হাজার) কোটি ১(এক) হইতে ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি পর্যন্ত	১০,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ড) ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি ১(এক) বা তদূর্দ্ধ	১৫,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

নোট :

(ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে।

(ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল ৬ অনুসারে

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণি	ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	হলুদ	২,০০০
২।	কমলা	৫,০০০
৩।	লাল	১০,০০০

- নোট: ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।
- ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলের কার্যালয়-
- **যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে, উহার অবস্থান যদি-**

(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় আছে এমন কোন জেলায় হয়, সে ক্ষেত্রে আবেদনপত্র উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(২) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোন জেলায় হয় সে ক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৩) কোন মহানগরে হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। মহানগরের জন্য আলাদা কার্যালয় না থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৪) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৫) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয়, সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সদর দপ্তর/প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

(৬) বাধ্যতামূলক ফিল্ড পূরণসহ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

চামড়া শিল্পের উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা: ট্যানারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এ অবস্থিত ট্যানারীসমূহের প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণে করণীয়

নাজিম হোসেন শেখ*

ভূমিকা

১৯৭০ এর দিকে এ দেশে চামড়া শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। শুরুর দিকে শুধুমাত্র ওয়েট ব্লু লেদার বিদেশে রপ্তানি করা হত। ওয়েট ব্লু লেদার হলো চামড়া হতে পশম আলাদা করে লবন দ্বারা সংরক্ষণ করা। দেশীয় উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের সাথে বিদেশি ক্রেতাদের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৩ সালে The Leather goods And Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB) নামীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা পায়। EBL Securities LTD. কর্তৃক ২০১৯ সালে প্রকাশিত Bangladesh Tannery & Footwear Industry Review রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে- দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপাদন করা হয়; যার মধ্যে মাত্র ২০-২৫% ব্যবহৃত হয়, বাকি চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশে প্রায় ২২০টি ট্যানারি, ৩৫০০ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এবং ৯০ টি বৃহৎ ফার্ম রয়েছে। স্থানীয় জুতার বাজার বাৎসরিক প্রায় ১৭০০০ কোটি টাকা। বছরে প্রায় ৩৭৮ মিলিয়ন জোড়া জুতা তৈরি করা হয়; যার মধ্যে ২০০-২৫০ মিলিয়ন জোড়া স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০২০ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে ফুটওয়্যার উৎপাদনে ৮ম স্থান অধিকার করে এবং বিশ্বের প্রায় ২.১% জুতা বাংলাদেশে তৈরি হয়। এছাড়াও চামড়ার তৈরি বেল্ট, ব্যাগ, জ্যাকেট, স্যুটকেস, ওয়ালেট এবং কিছু কারু পণ্য চামড়া শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। Leather goods And Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB) এর মতে এ খাতে প্রায় ০.৮৫ মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত; যাদের মধ্যে ৬০% নারী। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর তথ্য মতে গার্মেন্টস শিল্পের পর রপ্তানির ক্ষেত্রে ২য় অবস্থানে রয়েছে চামড়া শিল্প-খাত। এ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৯৪১.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে; যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২.৪৩% (৩৮.৭৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. পরিবেশ দূষণ;
২. সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব;
৩. নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়াদি;
৪. আমদানি নির্ভর যন্ত্রাদি ও কেমিক্যালস;
৫. আন্তর্জাতিক বাজারে আর্টিফিশিয়াল লেদারের চাহিদা বৃদ্ধি;
৬. মোট কাঁচা চামড়ার অর্ধেকই আসে ঈদ-উল-আযহায়;
৭. দক্ষ জনবলের ঘাটতি;
৮. পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব;
৯. উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ
১০. ইত্যাদি।

ট্যানারীসমূহের এলডব্লিউজি সনদ অর্জনে প্রতিবন্ধকতা

লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ(এলডব্লিউজি) হল একটি সংস্থা যা চামড়া উৎপাদনের কারণে পরিবেশগত প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এলডব্লিউজি সনদ পাওয়ার জন্য উৎপাদনকারীকে অবশ্যই শক্তির ব্যবহার এবং ওয়েস্ট ওয়াটার এর জন্য প্রোগ্রামগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে। এলডব্লিউজি সনদের ক্ষেত্রে ১৭টি বিষয় বিবেচনা করা হয়। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ম্যাটেরিয়াল ট্রেসেবিলিটি, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা, কঠিন ও তরল বর্জ্য, সুশাসন, শক্তি ব্যবহার, পানি ব্যবহার এবং বর্জ্য নি:সরণ।

মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং ৯৮১/১৯৯৪ মোতাবেক ২০১৭ সনে হাজারীবাগের মোট ১৫৫টি ট্যানারী কারখানা হেমায়েতপুর, হরিনধরা, বিসিক চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়। বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে মোট প্লট সংখ্যা-২০৫টি। চামড়া শিল্পনগরীতে

* উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

ট্যানারীর জন্য বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা ১৬২টি। বর্তমানে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪০টি। মহামান্য হাইকোর্টের ৪টি নির্দেশনা শতভাগ প্রতিপালন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক সাপেক্ষে জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ৮৮টি ট্যানারীকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। কমপ্লায়েন্স অর্জন না করায় বাকি ট্যানারী কারখানা এবং সিইটিপি পরিবেশগত ছাড়পত্র পায়নি। ট্যানারী স্টেটের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

পানি ব্যবহার

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী প্রতি টন চামড়া প্রসেসের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ টন বর্জ্য পানি নির্গমন করা যাবে। অধিকাংশ ট্যানারীর উৎপাদন কাজে প্রতি টন চামড়ার জন্য ৩০ টনের বেশি পানি ব্যবহার ও নির্গমন করা হয়।

ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট

ট্যানারীগুলো বিসিক চামড়া শিল্প নগরীতে অবস্থিত বলে ট্যানারীর উৎপাদিত তরল বর্জ্য কেন্দ্রিয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার এর মাধ্যমে পরিশোধন করা হয়। সাভার চামড়া শিল্প নগরীর তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত সিইটিপির কার্যকারিতা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এর লক্ষ্যে সিইটিপির দ্বারা পরিশোধনের পূর্বে এবং পরে তরল বর্জ্যের নমুনা অধিদপ্তরের গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৬ সাল হতে এ পর্যন্ত বার বার সিইটিপির ইনলেট এবং আউটলেট, বাইপাস ড্রেন, স্ট্রম ওয়াটার ড্রেন এবং নদীর পানির নমুনা পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে পাওয়া যায়। সিইটিপি'র দৈনিক পরিশোধন ক্ষমতা ২৫,০০০ ঘনমিটার হলেও ট্যানারী শিল্প এলাকায় ঈদ-উল-আযহার পরে দৈনিক সর্বোচ্চ প্রায় ৪০,০০০ ঘনমিটার পর্যন্ত তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৫,০০০ ঘনমিটার তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষমতা সিইটিপির নেই। এই অতিরিক্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সারফেস ড্রেনের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী নদীতে নির্গমন করা হয়। এছাড়া উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকারী ট্যানারীসমূহের নিজস্ব তরল বর্জ্য পরিশোধন করার ব্যবস্থা নেই।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট

সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে অবস্থিত ডাম্পিং ইয়ার্ডের জায়গার পরিমাণ প্রায় ৫.৫ একর। চামড়া শিল্প নগরীতে দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। বাৎসরিক প্রায় ৬৪০০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। ট্যানারীর উৎপাদন কার্যক্রমে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (তরল বর্জ্যের সাথে ক্রোম ও অন্যান্য কেমিক্যাল মিশ্রিত স্লাজ, ফ্লেশ, ঝিল্লি , চর্বি, চামড়ার কাটা টুকরো, শিং , পশম, হাড়ের টুকরো, চামড়ায় মিশ্রিত বালি, ক্রোম বিহীন চামড়ার কাটা টুকরো, ট্যানড স্প্লিটিং, সেভিং ডাস্ট, ক্রাস্ট এন্ড ফিনিশড চামড়া, ইত্যাদি) ৫.৫ একর জায়গার উপর স্থাপিত ডাম্পিং ইয়ার্ডে রাখা হয়। কিন্তু পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত ডাম্পিং ইয়ার্ডে কঠিন বর্জ্য অপরিকল্পিতভাবে রাখা হয়। ডাম্পিং ইয়ার্ডে ক্রোম যুক্ত এবং ক্রোম বিহীন কঠিন বর্জ্য আলাদা করে রাখার কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি।

CCRU (common chrome recovery unit) কার্যকর না থাকা

কাঁচা চামড়া প্রসেসিং এ ক্রোমিয়ামসহ অন্যান্য হেভি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। ট্যানারীসমূহের প্রসেসিং এর ফলে সৃষ্ট ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ তরল বর্জ্য নির্দিষ্ট পাইপলাইনের মাধ্যমে CCRU (common chrome recovery unit) তে প্রেরণ করা হয়। সিসিআরইউ থেকে ক্রোম রিকভারী হয়ে কেন্দ্রিয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রিয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের আউটলেটের নির্গত তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় ক্রোমিয়ামের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী নির্ধারিত মানমাত্রার বাহিরে। অর্থাৎ CCRU (common chrome recovery unit) কার্যকর নয়।

সিইটিপির পরিবেশগত ছাড়পত্র

চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত সিইটিপির অনুকূলে বিগত ২৪/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সিইটিপির অনুকূলে একই তারিখে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। সিইটিপি কর্তৃপক্ষ পরিবেশত ছাড়পত্র গ্রহণ ছাড়াই সিইটিপি চালু করেছে। যথাযথ কমপ্লায়েন্স অর্জন না করায় অদ্যাবধি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় নি।

ট্যানারীসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র

বর্তমানে চামড়া শিল্প নগরীতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকারী ট্যানারীর সংখ্যা ১৪০টি। এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টের ৪টি নির্দেশনা শতভাগ প্রতিপালন এবং আভ্যন্তরীন কমপ্লায়েন্স সন্তোষজনক সাপেক্ষে ০৬/০৬/২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮৮টি ট্যানারীকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ট্যানারীসমূহ যথাযথ কাগজপত্র দাখিল না করায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা প্রতিপালন না করায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

ট্যানারীসমূহের সমস্যা সমাধানে যা করা যেতে পারে

প্রতিটি ট্যানারিকে তাদের তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে প্রি-ট্রিটমেন্ট (Pre-Treatment) করতে হবে। এই প্রি-ট্রিটমেন্ট (Pre-Treatment)-এর অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত কার্যাবলী গ্রহণ করতে হবে:

ক. প্রত্যেক ট্যানারিকে ম্যানুয়ালি ডি-সল্টিং (Manual De-Salting)-এর পরিবর্তে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী Mechanical পদ্ধতিতে ডি-সল্টিং-এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. প্রত্যেক ট্যানারীতে নিজস্ব ক্রোম রিকভারী প্লান্ট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক ট্যানারীকে ক্রোমযুক্ত তরল বর্জ্য এবং ক্রোমবিহীন তরল বর্জ্যের জন্য আলাদা লাইন স্থাপন করে ক্রোমযুক্ত তরল বর্জ্য ক্রোম রিকভারি প্লান্টে বা ক্রোম সেপারেশন প্লান্টে এবং ক্রোমবিহীন তরল বর্জ্য সরাসরি সিইটিপিতে প্রেরণ করতে হবে। কোনভাবেই এই দুইধরনের তরল বর্জ্য একইসাথে একই লাইনের মাধ্যমে সরাসরি সিইটিপিতে প্রেরণ করা যাবে না।

গ. প্রত্যেক ট্যানারিকে ৪৮ ঘন্টার সেডিমেন্টেশন ট্যাংক (Sedimentation Tank) নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. প্রতিটি ট্যানারিকে আলাদাভাবে এবং সেইসাথে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP)-কে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. প্রত্যেক ট্যানারিতে তিন সাইজের (২৫ মিলিমিটার, ১২ মিলিমিটার এবং ৬ মিলিমিটার) বার স্ক্রিন স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ. ট্যানারি শিল্পসমূহে পানির অপব্যবহার রোধ করতে হবে এবং যথাসম্ভব beamhouse ও ট্যানিং অপারেশনে ব্যবহৃত পানির পুনঃব্যবহার (Reuse) নিশ্চিত করতে হবে। তরল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক ডিসচার্জ লাইন এবং দু'টি ট্যাংক (Beamhouse and Cr water-এর জন্য) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ. সিইটিপির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেক ট্যানারিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নির্ধারিত পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত চামড়া ওয়েট-ব্লু (Wet Blue) প্রসেস এবং ক্রাস্ট লেদার উৎপাদন করা যাবে না। প্রতি টন চামড়া ওয়েট ব্লু করার জন্য ৩০ ঘনমিটারের বেশি পানি ব্যবহার করা যাবে না।

জ. প্রত্যেকটি ট্যানারীকে কেমিক্যাল স্টোরেজ করার জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ঝ. ট্যানারী কারখানায় আন্তর্জাতিকমানের Good house keeping বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রমিকদের Occupational health and Safety measurement নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের গ্লাভস, বুট সহ অন্যান্য উর্পযুক্ত পোষাক সরবরাহ করতে হবে।

ঞ. বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী তফসিল-১ ভুক্ত কেমিক্যাল আমদানীর ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ট. প্রত্যেকটি ট্যানারীকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এবং অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী শতভাগ প্রতিপালন করতে হবে।

সিইটিপি

চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত সিইটিপির অনুকূলে বিগত ২৪/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান এবং সিইটিপির অনুকূলে একই তারিখে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। সিইটিপি কর্তৃপক্ষ পরিবেশত ছাড়পত্র গ্রহণ ছাড়াই সিইটিপি চালু করেছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা আইন ও বিধিসম্মত নয়। বিগত ২০১৬ সাল হতে অব্যাহতভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অমান্য করে বিসিক শিল্প নগরীর ট্যানারী কারখানার অপরিশোধিত তরলবর্জ্য অপসারণ করে ধলেশ্বরী নদী দূষণ করা হচ্ছে। বিসিক চামড়া শিল্প নগরী কর্তৃক স্থাপিত সিইটিপি যথাযথভাবে কার্যকর না করায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা হতে বিগত ০৪.১১.২০২০ তারিখ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর নির্ধারিত মানমাত্রার বেশী পাওয়ায় এবং অপরিশোধিত তরল বর্জ্য অপসারণ করে ধলেশ্বরী নদী দূষণ করায় ৪,৬২,৫০,০০০/-(চার কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদাণের জন্য বিসিক চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করা হয় ।

বিসিক চামড়া শিল্প নগরী হতে মূলত দুইভাবে তরলবর্জ্য দ্বারা দূষণ ঘটছে; যথা (১) অর্কাযকর সিইটিপি ও সিসিআরইউ দ্বারা এবং (২) অতিরিক্ত তরলবর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নির্গমণ দ্বারা। এছাড়াও, ট্যানারী শিল্প নগরীর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি।

সিইটিপিকে (CETP) কার্যকর রাখার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক. সিইটিপির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেক ট্যানারির চামড়া ওয়েট-ব্লু (Wet Blue) প্রসেস এবং ডায়িং প্রসেসের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। কোনভাবেই নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত তরল বর্জ্য নির্গমণ করা যাবে না। একইসাথে প্রত্যেকটি ট্যানারিতে আলাদা নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং ওয়েট-ব্লু (Wet Blue) প্রসেস ও ডায়িং প্রসেসে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে নদীর পানি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তি নদীর পানি ট্রিটমেন্ট করে ট্যানারীতে সরবারহ করতে হবে।

খ. বিদ্যমান CETP কে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেমন Moving Bed Biofilm Reactor প্রযুক্তি সংযোজন করে তরল বর্জ্যের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

গ. রেইন ওয়াটার (Rain Water) বা স্টর্ম ওয়াটার (Storm Water) এর জন্য নির্মি ড্রেনের মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য নির্গমণ করা যাবে না বা পিট (Pit) উপচে তরল বর্জ্য স্টর্ম ওয়াটার (Storm Water) ড্রেনে যেন না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (Water Treatment Plant)-এর রিজেক্ট ওয়াটার (Reject Water) যাতে কোনভাবেই অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে নির্গমন করা না হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া Effluent Pumping Station সার্বক্ষনিক চালু রাখতে হবে এবং কোনভাবেই অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইপাস (Bypass) লাইনের মাধ্যমে সরাসরি নদীতে নির্গমন করা যাবে না।

ঘ. প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ চামড়া শিল্প নগরীর কার্যক্রম ১০ (দশ) দিনের জন্য বন্ধ রেখে সিইটিপির পূর্ণাঙ্গ ওভারহলিং (Overhauling) সম্পন্ন করতে হবে। একই সাথে চামড়া শিল্প নগরীর কার্যক্রম বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রত্যেক ট্যানারি কারখানা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার ও ওভারহলিং (Overhauling) সম্পন্ন করতে হবে। সাভার চামড়া শিল্প নগরীর ট্যানারীসমূহ এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন উৎপাদিত তরল বর্জ্য নিঃসরন ২০ হাজার কিউবিক মিটারের বেশি না হয় এই বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং ট্যানারীসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সিইটিপির তৃতীয় পক্ষ অডিটের মাধ্যমে সমস্যা বের করে তার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর সিইটিপি মেইনট্যানেন্স এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. কোন ট্যানারি যদি আলাদাভাবে ইটিপি স্থাপনে আগ্রহী হয়, তাহলে সেই সকল ট্যানারিকে ইটিপি স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করতে হবে এবং ১ লাখ Square Feet বা তার অধিক আয়তনের ট্যানারিসমূহকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব ETP নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ৫-৭টি ছোট ও মাঝারি ট্যানারির সমন্বয়ে ক্লাস্টার (Cluster) গঠন করে ETP স্থাপন করা যেতে পারে। ফলে CETP তে তরল বর্জ্য পরিশোধনের চাপ কমে আসবে।

চ. সরকার প্রয়োজনে ট্যানারি শিল্পসমূহকে ETP তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে।

ছ. সিইটিপির জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

জ. Tannery Industrial Estate-এ তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করে Online Monitoring-ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

ঝ. স্থায়ীভাবে ঢাকা ট্যানারী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানী লিমিটেডকে (DTIEWTPCL) কেন্দ্রীয় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (CSTP) নির্মাণ করতে হবে।

ঞ. ক্রোমিয়াম রিকভারী করার জন্য সিইটিপিতে বিদ্যমান ccru (common chrome recovery unit) দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এছাড়া ক্রোমিয়াম রিকভারী করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে

১. এনজাইমেটিক ট্রিটমেন্ট ফর ক্রোমিয়াম সেপারেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. ইটিপির ইনলেট এবং আউটলেট ফিলট্রেশন পদ্ধতিতে ক্রোম সেপারেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট

সলিড ওয়েস্ট (Solid Waste)-এর জন্য নির্ধারিত ডাম্পিং ইয়ার্ড (Dumpimg Yard)-এর চারপার্শ্বে ন্যুনতম ১৫ থেকে ২০ ফিট উচ্চতার উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতে হবে। সলিড ওয়েস্ট এর জন্য নির্ধারিত ডাম্পিং ইয়ার্ড এর নিচে কনক্রিট (Concrete)-এর ঢালাই করতে হবে এবং সলিড ওয়েস্ট (Solid Waste)-এর জন্য নির্ধারিত ডাম্পিং ইয়ার্ড (Dumpimg Yard) সৃষ্ট চোয়ানী (Leachate) সিইটিপিতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে এই চোয়ানী (Leachate) কোনভাবেই যাতে পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরী নদীতে না যায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে সুষ্ঠু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে যেখানে কঠিন বর্জ্য হতে পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস, বায়ো এনার্জি, বায়ো ফার্টিলাইজার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হবে। ট্যানারী থেকে প্রাপ্ত কঠিন বর্জ্যসমূহ পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ৩টি ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা যেতে পারে। যথাক্রমে ১. ক্রোমিয়াম বর্জ্যের জন্য ১টি ডাম্পিং ইয়ার্ড ২. সিইটিপির স্লাজ, ফ্লেশ, চর্বি ও ঝিল্লির জন্য ১টি ডাম্পিং ইয়ার্ড ৩. চামড়ার কাটা টুকরো, শিং, পশম, হাড়ের টুকরা, চামড়ায় মিশ্রিত বালি ইত্যাদির জন্য আলাদা ১টি ডাম্পিং ইয়ার্ড। কঠিন বর্জ্যসমূহ হতে এক বা একাধিক বাই-প্রোডাক্ট তৈরীর উর্পযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবারহ করা যেতে পারে।

চামড়া শিল্প নগরীতে উৎপাদিত বাৎসরিক কঠিন বর্জ্যের নাম, পরিমাণ এবং উৎপাদিত বাই-প্রোডাক্ট এর তালিকা:

ক্রমিক নং	উৎপাদিত বর্জ্যের নাম	সম্ভাব্য পরিমাণ	সম্ভাব্য ব্যবহার
০১	ক্রোম বিহীন (raw trimmings)	১২,০০০ মেট্রিক টন।	গ্লু, জিলেটিন, পোল্ট্রি ফিড ইত্যাদি।
০২	Fleshing (ক্রোম বিহীন)	৩২,২০০ মেট্রিক টন।	গ্লু, জিলেটিন, তৈল, সাবান, বায়ো গ্যাস, কম্পোস্ট সার, প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট ইত্যাদি।
০৩	ট্যানড স্প্লিটিং (ক্রোমযুক্ত)	৫০০০ মেট্রিক টন।	লেদার ফাইবার বোর্ড, প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট, ব্রিক, পেপার, সিমেন্ট তৈরীর উপাদান ইত্যাদি।
০৪	শেভিং ডাস্ট (ক্রোমযুক্ত)	১১,৫০০ মেট্রিক টন।	লেদার ফাইবার বোর্ড, প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট, ব্রিক, পেপার, সিমেন্ট তৈরীর উপাদান ইত্যাদি।
০৫	ক্রাস্ট এন্ড ফিনিশড (ক্রোমযুক্ত)	২,৫০০ মেট্রিক টন্	চাবির রিং, মানি ব্যাগ, স্যান্ডেলের ফিতা ইত্যাদি।
০৬	সিইটিপি স্লাজ (ক্রোম যুক্ত)	৩,০০০ মেট্রিক টন।	ব্রিক, টাইলস ইত্যাদি। ব্রিক, টাইলস ইত্যাদি।

উৎপাদিত ক্রাস্ট (Crust) লেদারের শেভিং ডাস্ট (Shaving Dust) কোনভাবেই পোল্ট্রি বা অন্য কোন ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করা যাবে না। এই শেভিং ডাস্ট (Shaving Dust) যেন চুরি করে নিতে না পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তবে পরিবেশবান্ধব কোন বাই-প্রোডাক্ট প্রস্তুত বা ইনসিনারেটরের মাধ্যমে ভস্মীকরণ করা যেতে পারে। প্রি-ট্যানিং অপারেশনের ফলে সৃষ্ট ঝিল্লি, শ্লেষা, কাটা চামড়া ইত্যাদি গ্লু বা আঠা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা এ ধরনের বাই-প্রোডাক্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা যেতে পারে।

কোরবানীর সময় অতিরিক্ত চামড়া একবারে ওয়েট-ব্লু (Wet Blue) প্রসেস এবং ডায়িং প্রসেস সম্পন্ন না করে তা ধাপে ধাপে সিইটিপির ক্ষমতা অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্য চামড়া শিল্প নগরীতে বা এর আশেপাশে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করে সেখানে চামড়া সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংরক্ষিত চামড়ার ওয়েট-ব্লু প্রসেস এবং ডায়িং প্রসেস পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে।

চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত সিইটিপির বিস্তারিত ড্রয়িং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়নি। এছাড়া পরিবেশ আইন অনুসারে সিইটিপির জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশের পরিবেশ আইন/ বিধিমালা অনুসরন করে সিইটিপি কার্যকর এবং সলিড ওয়েস্ট ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে কার্যকর করা না হলে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স অর্জন করা সম্ভব নয়।

পেপার মাছরাঙ্গা:
একটি প্রাণের আত্মকাহিনী

খন্দকার মাহমুদ পাশা*
আফরোজা ইসলাম শশী**

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। গ্রীক পুরাণে আছে, একবার এক রাজা সমুদ্র যাত্রায় গিয়ে জাহাজ ডুবে মারা গেলেন। এ খবর রাণী যখন পেল তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ভালবাসার টানে তিনিও সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মারা গেলেন। আকাশের দেবতারা সহমর্মী হয়ে রাণীকে অবিকল আমার মত বানিয়ে দিলেন।

তোমরা বলোতো, আমি কে?

আমি দেখতে খাটো, মাথাটা বড় আর লম্বা ও সূচালো ঠোঁট নিয়ে আটোসাটো গড়নের। পুকুর বা জলাশয়ের পাড়ে গর্ত তৈরি করে আমার বসবাস। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আমার বিচরণ। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯০ ধরনের অবয়বে আমি দেখা দেই। তার মধ্যে ১২টি জাতে আমার অস্তিত্ব পাবে তোমাদের আস্তানায়।পাতি, নীল, সাদা, লাল, ছিট/পারকা, মেঘ হও, সবুজ, বাদামি, কালো, বুনো, খয়রাপাখ এসব জাতেই মোটামুটি তোমরা আমাকে চেনো। আগে বিল-ঝিল, নদ-নদী, খাল, জলাশয় ও পুকুর পাড়ে আমাকে দেখতে পেতে তোমরা। কিন্তু যেই থেকে তোমরা খাল-বিলের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে, সেই থেকে আমার কিছু প্রজাতি আজ বিপন্ন প্রায়, যার একটি হলো-মেঘ হও।

জেনে হয়তো তোমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ হবে না, তবু বলি, এদেশে একসময় আমাকে সংকটাপন্ন পাখির তালিকায় রাখা হয়েছিল।তবে ২০১৫ সালে আইইউসিএনের সর্বশেষ প্রকাশিত লাল তালিকায় আমাকে বিপদমুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এই যে আমি সংকটাপন্ন পাখির তালিকায় ছিলাম, সেই তালিকা থেকে বিপদমুক্ত হলাম; এসব কি তোমাদের মনে কোন প্রশ্ন জাগায় না?

আমি আর আমার প্রজাতিকে বিপদমুক্ত করার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান তোমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তাঁর নেতৃত্বে পরিবেশ সুরক্ষায় যে সকল কর্মকাণ্ড নেয়া হয়েছে, সেগুলোর ফলস্বরূপ আজ আমি আর বিপন্ন প্রাণী নই।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলেই জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ করা হয়। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনটির দ্বারা কমিশন আজ নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করে, নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করে, নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ করে, নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করে, বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করে। আর তোমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ সকল সুপারিশ অনুযায়ী তড়িৎ-গতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় আজ আমাদের বসবাসের জায়গা অনেক উন্মুক্ত। তাছাড়াও বর্তমান সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় বর্তমান সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করার সাথে সাথে এ সকল আইনের সঠিক প্রয়োগ করছে।

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা এলাকার পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ এর সফল কার্যকারিতার মাধ্যমে এখন আমার বিচরণ স্থানের পরিধি অনেক। ব্যক্তি মালিকানাধীন হিসেবে রেকর্ড করা পুকুরগুলো জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০ এর ২ (চ) ধারায় প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞাভুক্ত করে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তাই, আমি আবার গ্রাম বাংলার একেবারে আনাচে-কানাচে পুকুর পারে আমার বাসা করা শুরু করেছি।

যে সুন্দরবন নিয়ে তোমরা গর্ববোধ কর, সেই সুন্দরবনই এখন আমাদের আসল শহর। যে যাই বলুক আমরা মনে করি, সুন্দরবনের আসল সুন্দরী হলাম আমরা।

*সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
**ইন্সট্রাকটর (সাধারণ), প্রাইমারী টিসার্স ইনস্টিটিউট, মানিকগঞ্জ

তোমরা মানুষ। সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু তোমাদের কাজগুলো কীরকম যেন আজীব ধরনের। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ-তোমাদেরই গ্রামবাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে প্রচলিত এই প্রবাদটি আজ শুধুই অতীত। ছোট জীব হিসেবে, আমার ছোট্ট মনে আমি যতটা বুঝি, এই মুহূর্তে আমি তোমাদের সুন্দরবনের একটি বড় উপকরণ। কারণ, এই সুন্দরবনের পানিতে মাছের ভারসাম্য রক্ষায় আমি বড় ভূমিকা রাখছি। রোগাক্রান্ত ছোট মাছ খেয়ে আমি প্রাকৃতিকভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব কমাই। কিন্তু সুন্দরবন রক্ষায় সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা অজ্ঞতার কারণে, সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন খাল বিলে বিষ দিয়ে মাছ ধরছো। এতে ছোট মাছ নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমার ওপর, যে আমি তোমাদের ত্রাণকর্তা বলতে পারো। মনে পড়ে কী তোমাদের ভোলার লালমোহনের কথা? এক সময় সেখানে আমার ছিল অবাধ বিচরণ। লালমোহন তো একটি রূপকথা মাত্র,যে রূপকথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই বাংলার আনাচে কানাচে অগণিত জলধারাকে কেন্দ্র করে, যেখানে আমি থাকতাম, মনের সুখে গান গাইতে গাইতে মাছ শিকার করতাম। তোমাদের দেখতাম কখনো গোসল করতে নেমে, কিংবা সে পথ ধরে যেতে যেতে আমার অবস্থান আর আমার মাছ শিকারের সেই মনমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে। মাছ আমার প্রধান খাদ্য হলেও আমি পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, ইঁদুর, ছোট সরীসৃপ খেয়েও তোমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতাম। আর বিনিময়ে তোমরা কী করলে! পুকুরগুলোতে কীটনাশকের অতিরিক্ত ও অবাধ ব্যবহার করেছ, নিজের প্রয়োজনকে প্রকৃতির ডাক বানিয়ে এবং ময়লা-আবর্জনা দিয়ে করেছ পরিবেশ দূষণ, নির্বিচারে গাছ কেটেছ, অপরিকল্পিতভাবে বিস্তীর্ণ বনভূমি উজাড় করে কল-কারখানা-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছ, পুকুর-জলাশয় ভরাট করে আবাসন-প্রকল্প গড়েছ, ফেলেছ আমাদের চরম খাদ্যসংকটে। ফলশ্রুতিতে হারিয়ে গিয়েছি/যাচ্ছি এসব প্রকৃতি থেকে। তাতে তোমরা কী পেলে? বিনষ্ট অতীত।

আমি রূপে-গুণে অনন্য। আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য। আমি পরোপকারী। আর তোমরা পৃথিবীর সেরা জীব। কিন্তু তোমরা প্রকৃতি বিনষ্টকারী। তোমরা স্বার্থান্বেষী। নিজেদের স্বার্থ ভেবে নিয়ে তোমরা আমার মত প্রাণিদের চারণ ভূমিকে ফেলেছ হুমকির সন্মুখীন। কিন্তু মনে রেখ অন্যের জন্য খোঁড়া গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়। তুমি-আমি সবাই মিলেই আমরা একটি পরিবেশ। সেখানে সবার সমান অধিকার। পরিবেশ সুরক্ষায় প্রাণীবান্ধব পরিবেশ প্রথম শর্ত। কেননা, প্রকৃতির এই পরিবেশের অংশ যে কারো অস্তিত্ব বিলীন হলে নেমে আসবেই অনাকাঙ্খিত সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যার ফলাফল তোমরা ভোগ করছ এখন প্রতিনিয়ত। এক সময় নাতিশীতোষ্ণ দেশ ছিলে তোমরা, এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছো মরুময়তার দিকে। এর মূল কারণ তোমাদের অপ্রয়োজনীয় স্বার্থ। মনে রেখ, তোমাদের প্রকৃতিকে ভালোবেসে আমি এখনও একেবারে হারিয়ে যাইনি। তবে তোমাদের এই পরিবেশ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে বিলুপ্তহতে সময় নেব না। এভাবে তোমাদের পরিবেশের সবাইকে একেএকে হারিয়ে ফেলে তোমরা নিমজ্জিত হবে বিপর্যয়ের বিষপানে। এটা আমার কোনো অভিশাপ নয়, এটা শুধুই তোমাদের কর্মফল।

ভালো কথা, গ্রীক পুরাণে কথিত ভালবাসার জন্য প্রাণ দেওয়া সেই রাণীকে দেবতারা কী বানিয়েছিল ধরতে পেরেছিলে? হ্যাঁ, আমিই সেই মাছরাঙা! তোমাদের মাছরাঙা হয়েই ঘুরে-বেড়াতে চাই, তোমাদের বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে।

শব্দদূষণ: অপূরণীয় ক্ষতির কারণ

মোঃ ফজলে এলাহী*

শব্দদূষণ

শব্দদূষণ নীরব ঘাতক, না হলে সচেতন হবে ক্ষতি ভীষণ। কেননা মাটি, বায়ু ও পানি দূষণের ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতার তুলনায় এখনও শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতনতা খুবই কম। শব্দদূষণকে আমরা আমাদের আচরণের মধ্যে এমনভাবে মানিয়ে নিয়েছি যে, প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে শব্দদূষণের সাথে জড়িত এবং নিয়মিত এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সম্প্রতি যানবাহনের উচ্চমাত্রার বিকৃত হর্নের ব্যবহার, বিভিন্ন প্রচারণা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উৎসবে উচ্চশব্দে সাউন্ড সিস্টেম/মাইকের ব্যবহারে শব্দদূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। একটু সচেতনতার অভাবে পরিবেশকে আমরা ধীরে ধীরে বসবাসের জন্য অনিরাপদ করে ফেলছি।

কেন শব্দদূষণকে গুরুত্ব দেয়া উচিত

নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত শব্দই শব্দদূষণ যা প্রাণীর নার্ভাস সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায় এবং একপর্যায়ে তা স্থায়ীভাবে নষ্ট হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় দৈনিক ৮ ঘন্টা ৮৫ ডেসিবল-এর উচ্চ শব্দে নিয়মিত থাকলে মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখনও যেহেতু কানের রিপ্লেসমেন্ট সম্পর্কে কোন রেকর্ড নাই সেহেতু শব্দদূষণের কারণে যে ক্ষতি হয় সেটি প্রকৃত অর্থে অপূরণীয়। এছাড়াও অতিমাত্রায় শব্দদূষণের ফলে মানুষের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা এবং মনোসংযোগ নষ্টসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ বাচ্চা নষ্ট বা বধির/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্ম হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

অন্যদিকে উচ্চ শব্দে প্রাণির বংশ বৃদ্ধি ও শস্যের উৎপাদন এবং ফসলের মান কমে যেতে পারে। আতসবাজীর আকস্মিক শব্দে এবং তীব্র আলোর কারণে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে প্রাণির মৃত্যু ঘটতে পারে। নদীতে চলমান জলযানে উচ্চ শব্দে মাছের উৎপাদন কমে যায় এবং বিরল প্রজাতির প্রাণির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মানুষের জন্য নিরাপদ শব্দমাত্রা হচ্ছে গড়ে ৬০ ডেসিবল। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যানবাহনের বডি বা হর্ন থেকে ৭০-৯০ ডেসিবল এবং হাইড্রোলিক হর্ন ৯৫-১১৫ ডেসিবল শব্দ, ব্লেন্ডার মেশিন ৮৫ ডেসিবল শব্দ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক/সাইন্ড বক্স ১২০ ডেসিবল শব্দ, হেডফোন ১৩৫ ডেসিবল শব্দ, জরুরী সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহনে ব্যবহৃত সাইরেন ১৪০ ডেসিবল শব্দ তৈরি করে। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রধান সড়কের উপরে অবস্থিত। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী দীর্ঘসময় ঝুঁকিপূর্ণ শব্দমাত্রার মধ্যে অবস্থান করছে। এখনই শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে একটি বধির প্রজন্ম গড়ে গঠার ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

শব্দদূষণের কারণ ও উৎস

শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এর মাত্রা যেমন দিন দিন বেড়ে চলছে ঠিক একইভাবে জীবনকে আরামপ্রিয় করতে যন্ত্রের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দদূষণের নতুন নতুন উৎসও তৈরি হচ্ছে। নিয়ম না মেনে আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত শিল্প কল-কারখানা স্থাপন, দ্রুত নগরায়ন ও নির্মান কাজে প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছাড়া উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রাংশের ব্যবহার যেমন; ইটভাঙ্গা মেশিন, টাইলস কাটার মেশিন, রড কাটার মেশিন ব্যবহার, অযথা হর্ন বাজানো ও মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী হাইড্রোলিক হর্ন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ যানবাহনের ব্যবহার, দিনদিন জেনারেটরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক/সাইন্ড বক্স ও আতশবাজির ব্যবহার শব্দদূষণের প্রধান কারণ।

শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি

শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বলতে মানুষের বা কোনো প্রাণির শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ সৃষ্টির কারণে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝায়। ক্রমাগত শব্দদূষণের কারণে কানের টিস্যুগুলো আস্তে আস্তে বিকল হয়ে যায় এবং একসময় মানুষ স্বাভাবিক

*প্রকল্প ব্যবস্থাপক, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর

শব্দ শুনতে পায় না। শব্দদূষণের কারণে মাথা ধরা, শ্রবণশক্তি হ্রাস, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, মনসংযোগ নষ্ট ও অনিদ্রাসহ নানা ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শব্দদূষণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে শিশু ও বয়স্কদের। বিশেষ করে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য শব্দদূষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে যারা সরাসরি শব্দের উৎসে দীর্ঘসময় অবস্থান করে যেমন ট্রাফিক পুলিশ ও ড্রাইভার তারাও গুরুতর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর তথ্য মতে, ৬০ ডেসিবলের উর্ধ্বমাত্রার শব্দ মানুষকে সাময়িক বধির এবং ১০০ ডেসিবলের উর্ধ্বমাত্রার শব্দ মানুষকে পুরোপুরি বধির করে দেয়। দিনে ১২০ ডেসিবল এর আকস্মিক (Impulse) শব্দ ১০,০০০ বার একজন মানুষের জন্য সহনীয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের জরিপে দেখা যায় যে, দেশের কোনো কোনো স্থানে ১০ মিনিটে প্রায় ৯ শত বারের অধিক হর্ন বাজানো হয় যা আসলে আকস্মিক (Impulse) শব্দ। এই হর্ন অনেক সময় প্রায় ১২০ ডেসিবল পর্যন্ত শব্দ সৃষ্টি করে। সে হিসেবে অতিরিক্ত হর্ন ব্যবহারকারী স্থানসমূহে যে সমস্ত মানুষ অবস্থান করে থাকেন তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিশ্ব জনসংখ্যার মোট ৫ শতাংশ শব্দদূষণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সারা বিশ্বের ৩০টি কঠিন রোগের কারণসমূহের মধ্যে শব্দদূষণ অন্যতম। জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মাত্রা ৪৫ ডেসিবল। ৫০ ডেসিবলের উচ্চ শব্দ উচ্চ রক্তচাপের কারণ। ৬৫ ডেসিবলের উচ্চ শব্দ হৃদরোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। ৯০ ডেসিবলের অধিক শব্দ স্নায়ুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১২০ ডেসিবলের উচ্চ শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তি ধ্বংস করে বধির করে দেয়। গর্ভবতী নারী দীর্ঘ সময় শব্দদূষণের মধ্যে অবস্থান করলে বধির সন্তান জন্ম দেবার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শব্দদূষণ নিয়ে গবেষণা

শব্দদূষণ নিয়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষনার সংখ্যা খুবই সীমিত। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নরুপ:

১) পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৬-১৭ সালে বিভাগীয় শহরগুলোতে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করেছিলো। পরবর্তীতে ২০২২-২৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে ৬৪ জেলায় শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপের ফলাফলে বিভাগীয় শহরগুলোতে দেখা যায়, ঢাকাতে সর্বোচ্চ ১২৯.৪ ডেসিবল, চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ১২৭.২ ডেসিবল, সিলেটে সর্বোচ্চ ১০৭.৩ ডেসিবল, খুলনায় সর্বোচ্চ ১১৩.১ ডেসিবল, রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ১২৩.৭ ডেসিবল, রংপুরে সর্বোচ্চ ১২৮.৫ ডেসিবল, ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ ৮৬.৫ ডেসিবল এবং বরিশালে সর্বোচ্চ ১১৬ ডেসিবল শব্দ রেকর্ড হয় যা ২০১৬-২০১৭ অপেক্ষা অধিক। অর্থ্যাৎ কিছু কিছু জায়গায় শব্দের মাত্রা কমলেও সার্বিকভাবে দেশব্যাপী শব্দের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিভাগীয় শহরগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো বিভাগীয় শহরগুলোতে শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

২) নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট এর গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার দেড় মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শব্দদূষণের দ্বারা ক্ষতিগস্ত হচ্ছে। ঢাকার ৭০টি পয়েন্টে প্রতি মিনিটে হর্ন বাজে ১০০০ বারের ও বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাজে ফার্মগেট এলাকায়। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, দেশে বছরে শ্রবণশক্তি হারাচ্ছে ২৬০০ জন মানুষ। প্রতিবছর মাতৃগর্ভ থেকে বধির হয়ে জন্ম নিচ্ছে ২৫০০ জনেরও বেশী শিশু।

৩) বারডেম কর্তৃক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকার শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ থাকে ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থিত বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্টে। তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষই কানে কম শোনে।

৪) জার্নাল অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড পাবলিক হেলথ এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকায় প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষেরই হর্নের কারণে রাতে ভাল ঘুম হয়না।

৫) বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে। ইন্দোনেশিয়ার Wat State Elementary School in Medan শব্দদূষণ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে কতটুকু মানসিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তার উপর একটি গবেষণা

পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা যায়, শব্দদূষণের কারণে ২১% শিক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দবোধ করে না, ২১% শিক্ষার্থী উম্মাদের মতো আচরণ করে, ২০% শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হয়, ১৮% শিক্ষার্থী অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, ২০% শিক্ষার্থী অলস হয়ে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠান শব্দদূষণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এর উপর আরেকটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৮% শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি ব্যাহত হয়, ২০% শিক্ষার্থীর উন্নতি ব্যাহত হয়, ২০% শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ নষ্ট হয়, ২০% শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক শিখনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং ২২% শিক্ষার্থীর সামগ্রীক কর্মদক্ষতা বিঘ্নিত হয়।

৬) চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মানুষ গড়ে স্বাভাবিকভাবে ৪০ ডেসিবল মাত্রায় কথা বলে আর সহ্য করতে পারে ৭০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ।

৭) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দীর্ঘসময় ৬০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ মানুষকে সাময়িকভাবে এবং ১০০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ সম্পূর্ণভাবে বধির করে দিতে পারে। তাই পিক আওয়ারে ব্যস্ত শহরে শব্দের মাত্রা ৫৫ ডেসিবলের মধ্যে রাখার পরামর্শ দিলেও ঢাকায় শব্দের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ৮৫ ডেসিবল। ক্ষেত্র বিশেষে যা কখনও কখনও ১১৫ ডেসিবলও অতিক্রম করে। বিআরটিএ -এর হিসাব মতে এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত গাড়ীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৩২ টি এর মধ্যে মোটরসাইকেল এর সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৪৫ টি। রাজধানী ঢাকায় শব্দদূষনের ৫৬ থেকে ৬০ ভাগই হয় গাড়ীর হর্ন থেকে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

বায়ুদূষণ, পানিদূষণ বা মাটিদূষণের মতো শব্দদূষণকে প্রাথমিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সময়ের পরিক্রমায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান হওয়ায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যমান কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আলোকে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ প্রনয়ণ করা হয়েছে।

সরকার পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৭ সালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ২০২০ সালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন সেক্টরে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী কারণে নিয়মি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু অর্থাৎ জানুয়ারি ২০২০ থেকে এপ্রিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় ৭০ হাজার মানুষকে শব্দদূষণের বিষয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এর মধ্যে ড্রাইভারের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার জন। জানুয়ারি ২০২০ থেকে এপ্রিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৪৭০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫৪৮৯টি গাড়িকে মামলা করে মোট ৭০ লক্ষ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় ও ৪৭৬৮ টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীন বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন আগারগাঁও এলাকাকে "নীরব এলাকা" ঘোষণা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সকল সিটি কর্পোরেশন এরাকায় "নীরব এলাকা" ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ কাজও পরিচালনা করছে। এর ফলে শব্দদূষণের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষের জানার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। মানুষ সচেতন হলে শব্দদূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। তাই আমাদের সবাইকে শব্দদূষণ হ্রাসে সচেষ্ট হতে হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে সরকারিভাবে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ২০০৬ সালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন করা। এ বিধিমালায় অঞ্চল ভেদে সারা দেশকে নীরব, আবাসিক, মিশ্র, বানিজ্য ও শিল্প এই পাচঁটি এলাকায় ভাগ করে অঞ্চল ভেদে শব্দের মানমাত্রার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিধিমালায় বলা হয়েছে শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা নীরব এলাকায় দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫ ডেসিবল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০ ডেসিবল, বানিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবল।

এ বিধিমালায় আরও বলা হয়েছে, শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন ব্যবহার নিষেধ এবং নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো দন্ডনীয় অপরাধ। আবাসিক এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন ব্যবহার করা যাবে না। অনুমোদন সাপেক্ষে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা গেলেও তা দৈনিক পাঁচ ঘন্টা এবং রাত দশটার পর ব্যবহার করা যাবে না। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ভোর ৭ টা পর্যন্ত নির্মান কাজে শব্দদূষণকারী কোন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও ভূক্তভোগীরা মৌখিক বা লিখিতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা ৯৯৯ এ অভিযোগ করতে পারবেন।

অভিযোগে অপরাধ প্রমানিত হলে, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী, প্রথমবার অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডীত করা যাবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে দরকার মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত পরিবর্তন

আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে শব্দদূষণ এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, চাইলেই খুব সহজে এটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। এটি নিয়ন্ত্রণে যেমন সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, বাংলাদেশ ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন তেমনি সর্বসাধারণের সচেতনতাও আবশ্যক।

আমরা যদি বিভিন্ন উৎসবে মানমাত্রার মধ্যে শব্দযন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচার কাজে শব্দযন্ত্র ব্যবহারে আইন মেনে চলি, ধর্মের অপব্যাখ্যা না দিয়ে ধর্মীয় কাজে শব্দযন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, হর্ন থাকলেই তা বাজাতে হবে এমন মানসিকতা পরিবর্তন করে অযথা হর্ন না বাজানোর অভ্যাস তৈরি করতে পারি, নির্মাণ কাজে যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়ে এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে শব্দদূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনার স্বপ্ন দেখতে পারবো। অর্থাৎ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়মিত কাজ করে যেতে হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে, অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত ইর্ষান্বিত উন্নয়ন হয়েছে এবং সর্বোপরি জনসাধারণ সকল দিক থেকে সচেতন হচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে মানুষ নিজে থেকেই শব্দদূষণ এর ক্ষতিকর দিক অনুধাবন করে তাদের আচরণে পরিবর্তন আনবে।

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন, খরা ও পানি ব্যবস্থাপনা

মোঃ রবিউজ্জামান*

বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিচিতি: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং নাটোর, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল গঠিত। বরেন্দ্রভূমি প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত অতি প্রাচীন একটি ভূমিরূপ। প্লাইস্টোসিন যুগ প্রায় ২৫,৮০,০০০ বছর পূর্বে শুরু হয় এবং ১১,৭০০ বছর পূর্বে শেষ হয়। এ ভূমিরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: এটি আশেপাশের সমতল ভূমি হতে অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সিঁড়ির ন্যায় সোপান বিশিষ্ট। অতি প্রাচীনকালে সৃষ্টি হওয়ায় এ অঞ্চলের মাটি এঁটেল প্রকৃতির এবং খুব শক্ত হয়। ফলে মাটির ভেতর বায়ু ও পানি চলাচল খুব ধীর গতির হয়। এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৪০ ফুট। এ ছাড়াও, খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ভূমিরূপ এবং এঁটেল মাটির কারণে বৃষ্টিপাতের পানি স্থির হতে পারে না, ছোট ছোট নদী ও খাল বেয়ে বড় নদীতে চলে যায়। ফলে মাটি সারা বছর প্রায় শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রা, বর্ষাকালে স্বল্প বৃষ্টিপাত ও শীতকালে তীব্র শীত - এ অঞ্চলের জলবায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও, গাছ-পালার বিস্তৃতি বিশেষ করে প্রাকৃতিক বনভূমি নেই বললেই চলে। ফলে বাস্তুতান্ত্রিকভাবেই এ অঞ্চল শুষ্ক ও রুক্ষ। এ কারণেই এ অঞ্চল খরা পীড়িত এলাকা হিসেবে পরিচিত।

বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন: বরেন্দ্র অঞ্চলের গড় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০০-১৪০০ মি.মি. যা দেশের গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় অর্ধেক। শীত কালের গড় তাপমাত্রা ৯০সে. থেকে ১৫০সে. পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা ২৫০সে. থেকে ৩৫০সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে জলবায়ুর এই গড় অবস্থার মধ্যে ব্যাপকভাবে ভিন্নতা (variability) পরিলক্ষিত হয়। যেমন: এ বছর (২০২৪) এপ্রিল মাসে রাজশাহীতে ৪২.৭০ সে. রেকর্ড করা হয় যা বিগত প্রায় ৭০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অপরপক্ষে, এ সময় এ অঞ্চলে কোন বৃষ্টিপাত ঘটে নি। আবহাওয়ার এমন ভিন্নতা বিগত দশক ধরেই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৮০-২০১৭, এই ৩৭ বছরে গড়ে প্রতি বছর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.০১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস হারে যা জাতীয় গড়ের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ। অপরপক্ষে, বৃষ্টিপাত প্রতি বছর গড়ে ০.৮৭ মি.মি. হ্রাস পেয়েছে, যেখানে দেশের মোট বৃষ্টিপাত প্রতি বছর ৮.৪ মি.মি. হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু উত্তরোত্তর প্রতিকূল হয়ে উঠছে-এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: বাস্তুসংস্থানগতভাবেই (খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ভূমিরূপ, স্বল্প বৃষ্টিপাত, অধিক তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক বনভূমির অভাব ইত্যাদি) বরেন্দ্র অঞ্চল খরা প্রবণ হিসেবে পরিচিত। তবে এ অঞ্চলের খরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বা মরুভূমির মত নয়। এদেশের খরা মূলতঃ কৃষির সাথে সম্পর্কিত । যেমন: সাধারণ কৃষকরা মনে করেন, বৃষ্টিপাতের অভাবে যখন ফসল পুড়ে যায়, তখন তাকে খরা বলে। বিজ্ঞানের ভাষায়, খরা হলো মাটির আর্দ্রতা এমন পর্যায়ে হ্রাস পাওয়া, যার ফলে উদ্ভিদ বা ফসল মাটি হতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পানি শোষণ করতে পারে না, ফলে মারা যায়। এভাবে খরার কারণে কৃষকের ফসল নষ্ট হয়।

খরা বাংলাদেশের একটি ঋতুভিত্তিক প্রাকৃতিক ঘটনা বা দুর্যোগ, যা সাধারণত গ্রীষ্মকাল বা এপ্রিল-মে মাসে ঘটে থাকে, কারণ এ সময় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীয়-প্রস্বেদন (যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি শোষণ করে বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাতাসে ছেড়ে দেয়) অনেক বেশি হয়, বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা প্রায় ৪০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে মাটির আর্দ্রতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং খরা সংঘটিত হয়। উপরে উল্লিখিত তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের হ্রাস, খরা সংঘটনের এ মাত্রাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কৃষির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরার প্রভাব: বাংলাদেশে খরা সংঘটনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৬০ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত ছোটো-বড় ১৯টি খরা সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতি ২.৫ বছরে ১টি খরা সংঘটিত হয়েছে। এ সকল খরায় গড়ে দেশের প্রায় ৪৭% ফসলি জমি এবং ৫৫% মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। খরার ভৌগলিক বিন্যাস থেকে দেখা যায়, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলায় মাত্রাতিরিক্ত খরা ও অতিখরা সংঘটিত হয় (চিত্র-১)। ফসল-মৌসুম ভিত্তিক খরা মোকাবেলায় দেখা যায়, রবি মৌসুমে প্রায় ১০.৩২% এবং ৩৩.৭৮% জমি যথাক্রমে মাত্রাতিরিক্ত খরা (Extreme Drought) ও অতি-খরায় (Severe Drought) আক্রান্ত হয়। এছাড়াও, মধ্যম মাত্রার খরা দ্বারা ৪৩% জমি আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ রবি মৌসুমে এ তিনটি জেলার প্রায় ৮৭% জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় আক্রান্ত হয়। প্রি-খরিফ বা খরিফ-১ (গ্রীষ্ম) মৌসুমে খরা আক্রান্ত এলাকা অনেক বেড়ে যায়। অনেক অতি-খরা আক্রান্ত এলাকা মাত্রাতিরিক্ত খরা আক্রান্ত এলাকায় রূপান্তরিত হয়, আবার অনেক মধ্যম-খরা আক্রান্ত এলাকা অতি-খরা আক্রান্ত এলাকায় রূপান্তরিত হয়। যেমন: এ মৌসুমে গড়ে

* ব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

৩৯.২১% এলাকা মাত্রাতিরিক্ত খরায় আক্রান্ত হয় এবং ৩০.৭৮% এলাকা অতি-খরায় আক্রান্ত হয়। আইপিসিসি-এর প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে এ ধরণের খরার মাত্রা ও এলাকা আরও বৃদ্ধি পারে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৯-২০১৪ সময়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে খরার কারণে ২৫-৩০% ফসল উৎপাদন কম হয়েছিল যার আর্থিক মূল্য ১২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। খরার কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাষযোগ্য জমি চাষ-অযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল যার ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয় ৯.৩১ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

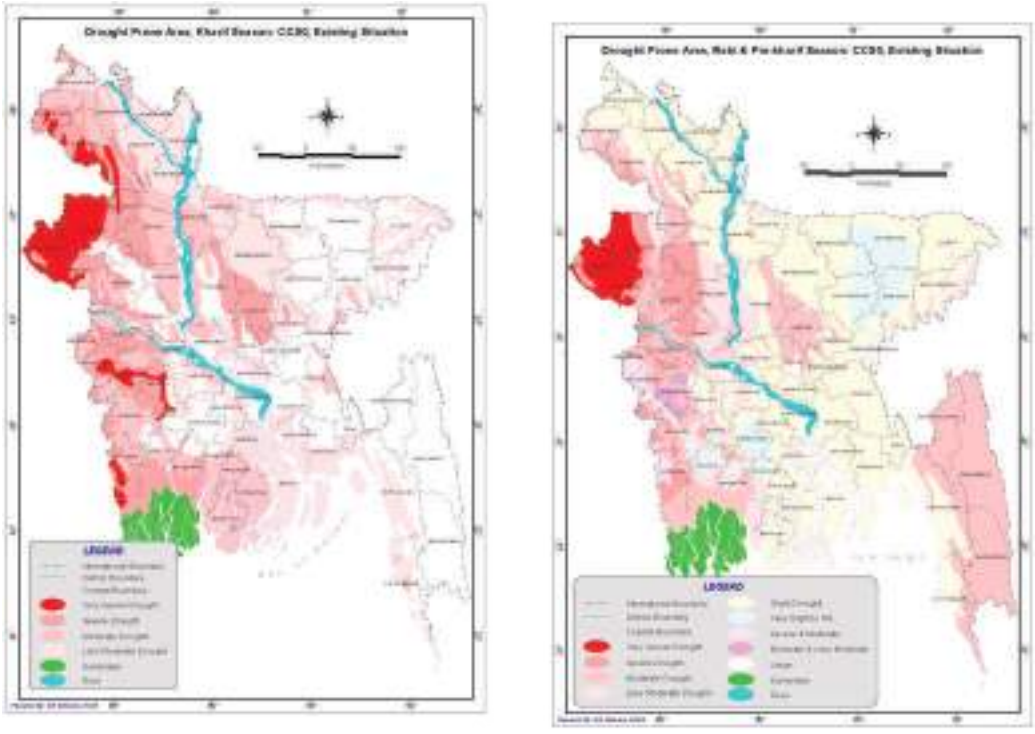

চিত্র-১: বাংলাদেশে খরার বিস্তৃতি

মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর খরার প্রভাব: খরা প্রাথমিকভাবে খাবার, গৃহস্থালী ও সেচের পানির প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে। খরার ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎসসমূহ যেমন: পুকুর, খাল, বিল এবং ছোট ছোট নদীগুলো শুকিয়ে যায়। এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রভাব হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরও নীচে নেমে যায়। সুতরাং খরার কারণে মানুষের প্রয়োজনীয় পানির সকল উৎসই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পানির প্রকট সংকট দেখা দেয়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, বরেন্দ্র এলাকার ৫৯.২% খানার খাবার পানি খরায় আক্রান্ত হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৯-২০১৪ সময়ের তথ্য হতে দেখা যায়, সার্বিকভাবে, বরেন্দ্র অঞ্চলের ২৫.৩৯% খানা খরা দ্বারা আক্রান্ত ছিল, যেখানে জাতীয় গড় ১৪%। এ সময় ঐ অঞ্চলের ৮.৭% মানুষ খরার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও প্রায় ১৪,০০০ মানুষ তাপদাহে আক্রান্ত হয়েছিল।

খরা বরেন্দ্র অঞ্চলের মহিলা ও কিশোরীদের জন্য আরও দুর্ভোগ বয়ে আনে। কারণ তারা সাধারণত পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে থাকে। নিকটবর্তী পানির উৎস শুকিয়ে গেলে দূরবর্তী কোন উৎস হতে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এতে যেমন সময় অপচয় হয়, তেমনি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ফলে তারা পরিবারের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। উপরন্তু, তাদের শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজার রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

খরা মোকাবেলায় বর্তমান পদক্ষেপসমূহ: বাংলাদেশ সরকার বরেন্দ্র এলাকায় খরা মোকাবেলা করে ফসল উৎপাদনের জন্য আশি'র দশকে 'Barind Integrated Area Development Project (BIADP) বা বরেন্দ্র সমন্বিত এরিয়া উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি ১৯৮৪ সালে শুরু হয়ে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিএমডিএ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিএমডিএ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ধূসর বরেন্দ্র অঞ্চলটি শস্য ও গাছ-পালায় পূর্ণ সবুজ অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়। এ সবুজায়নের

পেছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সেচের জন্য ব্যাপকভাবে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা। ২০১৯ সাল পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, বিএমডিএ ১১,৭০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। এ সমস্ত নলকূপের প্রভাবে কোন কোন এক-ফসলি জমি তিন-ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এভাবে নির্বিচারে পানি উত্তোলনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর ৭-৮ মি.মি. হারে নীচে নেমে যাচ্ছে। কোন কোন এলাকায় পকেট একুইফারগুলো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। ফলে অনেক গভীর নলকূপ ও হস্তচালিত নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ভাষায় একে বলা হয় Maladaptation বা অনাকাঙ্খিত অভিযোজন।

বিষয়টি উপলব্ধি করে বিএমডিএ বর্তমানে কোন নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন করছে না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ সমস্ত উদ্যোক্তাগণ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শক্ত পাথরের স্তর ভেদ করে গভীর নলকূপ স্থাপন করছে এবং সেখান থেকে পানি উত্তোলন করছে। এ ধরণের উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে পাথরের স্তর কেটে নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে নির্বচারে পানি উত্তোলনের ফলে ভূমিধ্বসসহ নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

খরা মোকাবেলায় ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন: বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকরা দীর্ঘদিন যাবত খরা মোকাবেলায় অভ্যস্ত। খরা অভিযোজনে তাদের যথেষ্ট সক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রমাণিত। উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকরা, বিশেষকরে পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর, নাচোল, গোমস্তাপুর ইত্যাদি এলাকা ঘুরে দেখা যায়, অনেক কৃষক ধান চাষের জমিতে আম ও ড্রাগন ফলের চাষ করছে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন করে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রতিবেশবিরোধী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড: বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমিরূপ ও জলবায়ু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ অঞ্চলটি সাধারণত শুষ্ক ও পানি-স্বল্পতা বিদ্যমান। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র কাঁটাজাতীয় গুল্ম ও লতা ব্যতীত প্রাকৃতিক উদ্ভিদরাজির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ তথ্য দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, এ ধরণের প্রতিবেশে স্বল্প-পানিতে উৎপাদন সম্ভব- এমন ফসল ও চাষ পদ্ধতির প্রচলন ও সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন ছিল। খাদ্য-স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে অত্যধিক পানিগ্রহণকারী ধান চাষের প্রবর্তন করা হয়। ধানকে অত্যধিক পানিগ্রহণকারী ফসল বলা হয় কারণ, ১ কেজি ধান উৎপাদনের জন্য প্রায় ৪,০০০ লিটার পানির প্রয়োজন। শুধু নওগাঁ জেলাতেই এ বছর বোরো মৌসুমে প্রায় ১৩ লক্ষ টন ধান উৎপাদিত হয়। এতেই বুঝা যায়, প্রতি বছর বিশেষ করে, বোরো মৌসুমে এবং আউস মৌসুমে ধান চাষের জন্য কি পরিমাণ পানি উত্তোলনের প্রয়োজন হয়! এ পানির ৯০%-এর উৎস ভূ-গর্ভস্থ আধার। আরও আশংকার বিষয় হলো, গত দুই দশক ধরে এ অঞ্চলে পুকুর খনন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। যে প্রতিবেশে পানি দুষ্প্রাপ্য, সেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে মাছ চাষ করা- এটি অবশ্যই প্রতিবেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড, যা কখনোই টেকসই হতে পারে না।

বরেন্দ্র অঞ্চলে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা: বরেন্দ্র অঞ্চল তিনটি কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত, এগুলো হলো- ২৫, ২৬ এবং ২৭। এর মধ্যে ২৫ হলো উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চল, ২৬ নং হলো মধ্য-উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চল এবং ২৭ নং হলো সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল। কৃষি যেহেতু এ অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাই কৃষিকে কেন্দ্র করেই পানি ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র কৃষি ও পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই এ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কনভেশনের (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF) অর্থায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরা অভিযোজনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা মূলনীতি 4-R (recharge, reduce, reuse and recycle) প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করছে। প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে: ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুদ্ধার (re-generation) করার জন্য কৃত্রিমভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ করা এবং পুকুর ও খাল পুনঃখননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা। এছাড়াও, প্রকল্পটি খরা-সহিষ্ণু ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে বোরো মৌসুমে পানির ব্যবহার ৭০% হ্রাস করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এতে প্রতিবেশ রক্ষা পাবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার
(Zero Waste Dairy Farm)

ড. মোঃ রাকিবুল হাসান[১]*, আনোয়ার হোসেন[১], ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান[১]
আয়েশা সিদ্দিকা আফসানা[১], সোনিয়া সুলতানা[১] এবং ড. নাসরিন সুলতানা[২]

উপক্রমণিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনে অনেকটা উন্নতি (মাথাপিছু দৈনিক প্রাপ্যতা ২২১.৮৯ মি.লি. (ডিএলএস, ২০২৩)) করলেও দুগ্ধ খামারগুলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাপক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠছে ছোট বড় ডেইরি খামার। এসব ডেইরি খামারের সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে সৃষ্ট অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে যা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুধ ও মাংসের ন্যায় গোবর ও গো-মূত্রেরও আর্থিক গুরুত্ব রয়েছে। দুগ্ধ খামারে বর্জ্য পদার্থের মধ্যে গোবর অন্যতম। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধমে গোবর হতে পারে ডেইরি খামারের একটি অন্যতম অর্থকরি সম্পদ। গোবর একটি সম্পূর্ণ বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য, এটিকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করা সহজ। গোবর থেকে বায়োগ্যাস, জৈব সার ও ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়। এতে বায়োগ্যাস থেকে যেমন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাবে, তেমনি জৈব সার জমিতে ব্যবহার করে ফসল ও ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ ও মানুষের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব কমে যাবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ও গবাদিপশু পালন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এস, আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত-২০২৩) প্রণয়ন করে। এই বিধিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত-২০২৩) এর উপ-বিধি (১) এ তফসীল-১ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পকারখানা ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে মোট চারটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিসমূহ হলো- সবুজ, হলুদ-ক, কমলা এবং লাল। সবুজ শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশগত নেতিবাচক কোনো প্রভাব নেই। হলুদ ও কমলা শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশের উপর স্বল্প থেকে মধ্যম মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে যেগুলো সহজেই নিরাময়যোগ্য। লাল শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং এ প্রভাব নিরসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন হয়। গবাদিপশু পালন কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য বিবেচনায় এটিকে ভিন্ন ভিন্ন ২টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন:

সবুজ শ্রেণিভুক্ত	হলুদ শ্রেণিভুক্ত
গো-খামারে গরু বা মহিষের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টি বা এর নিচে এবং গ্রামে গরুর সংখ্যা ২৫টি বা এর নিচে।	গো-খামারে গরু/মহিষের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টির উর্ধ্বে এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) টির উর্ধ্বে।

উল্লেখ্য যে, সকল শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রয়োজন।

বাংলাদেশে গবাদিপ্রাণির উৎপাদিত বর্জ্যের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫৬ হাজার গরু আছে (ডিএলএস, ২০২২-২৩)। এগুলোর মধ্যে আনুমানিক ৫০ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক গরু এবং বাকি ৫০ শতাংশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক গরু। দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক গরু সমান একটি প্রাপ্তবয়স্ক গরু হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সে ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তবয়স্ক গরুর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট গরুর সংখ্যার ৭৫ শতাংশ। সুতরাং মোট প্রাপ্তবয়স্ক গরুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৮৫৬০০০, ৭৫%=১৮৬৪২০০০ টি। বাংলাদেশে গড়ে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গুরুর ওজন ৩৫০ কেজি এবং প্রতিটি গরু দৈনিক ২১ থেকে

* [১]ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১;
[২]পরিচালক গবেষণা এর দপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

২৪ কেজি গোবর ত্যাগ করে থাকে (শারীরিক ওজনের ৭-৮%, পালমা,২০১৯)। ফলে প্রতিদিন গড়ে ৪.২৮ লক্ষ টন গোবর উৎপাদন হয় যার অধিকাংশ পরিমাণ বর্জ্যে পরিণত হয়ে পরিবেশ দূষণ করে। এছাড়াও, একটি গরু দিনে গড়ে প্রায় ২.৫ কেজি খাবার নষ্ট করে (রিক রাসবি,২০২৪) যা বর্জ্য হিসেবে থেকে যায়। সুতরাং উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় ৪৬.৬ হাজার টন। গবাদিপ্রাণির মূত্র এবং খামার পরিষ্কার করা পানিও বর্জ্য হিসাবে পরিবেশ দূষিত করে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরু হতে প্রতিদিন গড়ে ১০-১৩ লিটার মূত্র ত্যাগ করে (পালমা,২০১৯) সে হিসেবে দেশের ১.৮৬ কেটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরু হতে প্রতিদিন প্রায় ২২.৩২ কোটি লিটার গো-মূত্র উৎপাদিত হচ্ছে।

গবাদিপ্রাণির বর্জ্য সমস্যা না সম্পদ

গবাদিপ্রাণির খাবারের ৩০-৪৫ শতাংশই গোবরে পরিণত হয় (হাবিব, ২০১৯)। সুতরাং, গোবর একটি উৎকৃষ্ট যৌগ যাতে কৃষি কাজের উপযোগী এবং ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু মোট উৎপাদিত গোবরের তুলনায় এর ব্যবহার খুবই কম। অন্যদিকে প্রতি কেজি গোবর থেকে ০.০২৫-০.০৫ কিউবিক মিটার বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয় (দুগাল, ২০০২)। সে হিসেবে মোট উৎপাদিত গোবর থেকে দৈনিক প্রায় ১২.৮৬ মিলিয়ন কিউবিক মিটার বায়োগ্যাস উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ১৩ হাজার টন কয়লা সাশ্রয় করা সম্ভব। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত স্লারি বায়ো-ফার্টিলাইজার, বায়ো-পেস্টিসাইড,মাছের খাবার হিসেবে ও মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায় (যুবাইদা, ২০১৯)। অন্যদিকে, প্রতি কেজি গোবর হতে ৫০-৫২% কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়, সে মোতাবেক দৈনিক ২.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন কেঁচো সার পাওয়া সম্ভব। প্রতি লিটার গো-মূত্রে ২.৫% ইউরিয়া থাকে, সে হিসাবে দৈনিক ১০ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করা যেতে পারে। সুতরাং গোবর ও গো-মূত্রের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি ও সারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, গোবরের এরূপ পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সইড, নাইট্রাস-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কম হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর দূষণের প্রভাব কমে যায়। উল্লেখ্য, গো-খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বর্জ্যও একটি নির্দিষ্ট স্থানে পচিয়ে গোবরের সাথে মিশিয়ে বায়োগ্যাস বা কেঁচো সার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে কেবল মাটির গুণাগুণই নষ্ট হয় না, বরং ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের অবশিষ্টাংশ নদী, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদিতে মিশে পানি দূষিত করে। ফলে মাছসহ জীব-বৈচিত্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে উৎপাদিত গোবরকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে কেঁচো সার উৎপাদন করে জমিতে ব্যবহার করলে তা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিসহ পরিবেশ সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে গবাদিপ্রাণির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে অধিকাংশ বাণিজ্যিক খামার বা পারিবারিক পর্যায়ে দুগ্ধ খামারগুলিতে পরিকল্পিত ভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয় না। অনেকে নিজ উদ্যোগে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করলেও বায়োগ্যাস প্লান্টের স্লারি সঠিক ব্যবস্থাপনা করে না। গ্রামীন রাস্তাঘাট, পুকুর, ডোবা ও খালে বিক্ষিপ্তভাবে স্লারি ফেলানো হয় ফলে পরিবেশ বিশেষ করে বাতাস ও পানি দূষিত হয়। খোলা স্থানে এ সব ফেলানোর কারণে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে ফলে মানুষকে অস্বস্তি পোহাতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গোবর ও উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে সৃষ্ঠ বর্জ্য খামার সংলগ্ন কোন গর্তে অপরিকল্পিতভাবে রাখা হয় এবং কিছুদিন পর সার হিসেবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা হয়। তবে এ সার অত্যন্ত নিম্ন মানের হয়ে থাকে। অধিকাংশ খামারি কেঁচো সারের উৎপাদন পদ্ধতি ও এর গুনাগুন সম্পর্কে অবহিত নন। অনেকে গোবর রোদে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বৃষ্টির পানির সাথে গোবর জলাশয়ে গিয়ে পানি দূষিত করে, পানির অক্সিজেন কমিয়ে দেয় ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই এবং এ বিষয়ে সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা সম্পর্কেও সচেতন নন। গবাদিপ্রাণির খামার পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি নয়। বেশিরভাগ খামারে মলমূত্র নিষ্কাশনের ড্রেন নেই এবং গবাদিপ্রাণির ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ সীমিত।

গো-খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে সাধারণত পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু পালন করা হয়। অধিকাংশ পরিবার ২-৩ টি (গরু বা মহিষের) গবাদিপশু পালন করে থাকে। ফলে সেসব পরিবারের গবাদিপ্রাণির বর্জ্য স্বল্প পরিমাণ উৎপাদিত হয় যা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা কঠিন হয়। এ সমস্ত পরিবার সাধারণত গোবর শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে বা উন্মুক্ত গর্তে ফেলে রাখে। পৃথক পৃথক পরিবারসমূহকে একত্র করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করাও একটি দুরূহ কাজ। তবে সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

শূন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কি?

শূন্য বর্জ্য বা বর্জ্য ন্যূনতমকরণ হল বর্জ্য উৎপন্ন হওয়া প্রতিরোধের লক্ষ্যে রিসোর্স লাইফ সাইকেলকে পুনঃডিজাইন করা যাতে সমস্ত পণ্য পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এ ধারণাটির লক্ষ্য ছিল ল্যান্ডফিল, ইনসিনেরেটর ও মহাসাগর বা পরিবেশের অন্য কোনো অংশে আবর্জনা দ্বারা দূষণ এড়ানো। একটি শূন্য বর্জ্য ব্যবস্থায়, সর্বোত্তম ব্যবহারের মাত্রায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত উপকরণ পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

শূন্য বর্জ্য বলতে বর্জ্য প্রতিরোধকে বোঝায় যা একটি 'পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম' বা পদ্ধতি যা সমাজের মধ্য দিয়ে পদার্থের প্রবাহ পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখে, যার ফলে কোনো অপচয় হয় না। "শূন্য বর্জ্য" বর্জ্য হ্রাস , পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার করার মাধ্যমে বর্জ্য নির্মূল করার চেয়ে আরও বেশি উপযোগী ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বর্জ্য হ্রাস করার লক্ষ্যে বর্জ্যের বিতরণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"শূন্য বর্জ্য" বর্জ্য নির্মূল করার জন্য ক্রমাগত কাজ করার দিকে নির্দেশিকা প্রদান করে।

জিরো ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (জেডব্লিউআইএ) অনুসারে, শূন্য বর্জ্য হল দায়িত্বশীল উৎপাদন, ব্যবহার, পুনঃব্যবহার এবং সমস্ত পণ্য, প্যাকেজিং ও উপকরণ না পোড়ায়ে এবং ভূমি ও জলে নিক্ষেপ না করে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সমস্ত সম্পদের সংরক্ষণ।

শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার তৈরিতে করণীয়

শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার একটি নতুন ধারণা হলেও এটি বাস্তবায়ন করা কোন জটিল কাজ নয়। এ জন্য প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিক নিয়মে যথাস্থানে খামার স্থাপন করতে হবে। খামারে উৎপন্ন বর্জ্য, উচ্ছিষ্ট ও ব্যবহৃত পানি যথাযথভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিষ্কাশিত বর্জ্য পরিকল্পিতভাবে ও নিম্নোক্ত পরিবেশবান্ধব উপায়ে ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে-

ক. বায়োগ্যাস উৎপাদন

খ. কম্পোস্ট সার তৈরি

গ. ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার তৈরি ও

ঘ. গো-মূত্র প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার

ক. বায়োগ্যাস উৎপাদন: বায়োগ্যাস হলো পচনশীল জৈব বস্তু হতে উৎপাদিত এক ধরনের জ্বালানি গ্যাস। সব প্রাণীর মল ও পচনশীল আবর্জনা ব্যবহার করে এই গ্যাস উৎপাদন করা যায়। গবাদিপ্রাণীর গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতে পচানোর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তা হচ্ছে বায়োগ্যাস। তবে গৃহপালিত বা বাণিজ্যিক ভাবে পালিত প্রাণীর মল সহজলভ্য বলে বায়োগ্যাস উৎপাদনে এগুলোই বেশি ব্যবহৃত হয় থাকে। বায়োগ্যাস বলতে আমরা প্রধানত মিথেন গ্যাসকে বুঝে থাকি। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট স্লারি উত্তম জৈব সার হিসেবে বেশ কার্যকরী।

বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামালঃ যে কোনো পচনশীল বস্তু বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-

- মলমূত্র (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি,মানুষ ইত্যাদি)
- শাকসবজি,তরকারি, ফল-মূল ও মাংসের অবশিষ্টাংশ
- লতাপাতা, বিভিন্ন আবর্জনা ও কচুরিপানা।

বায়োগ্যাস এর ব্যবহার: দুগ্ধ খামারের বর্জ্য হতে উৎপাদিত বায়োগ্যাস জ্বালানি হিসেবে রান্না-বান্না ও বাল্ব জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যায় এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে উৎপাদিত স্লারি নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবহার করা যায় । যেমন-

- বায়োস্লারি সেচের পানির সাথে জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়
- বায়োস্লারি শুকনো গুড়া সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়
- বালাইনাশক হিসেবে ফসলের মাঠে প্রয়োগ করা যায়
- মাছের খাবার হিসেবে সরাসরি পুকুরে প্রয়োগ করা যায়
- এ ছাড়া মাশরুম চাষে বায়োস্লারি ব্যবহার করা যায়।

খ. কম্পোস্ট সার তৈরিঃ দুগ্ধ খামারে গাভীর গোবর ও মলমূত্র পচানোর মাধ্যমে জৈব সার বা কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। কম্পোস্ট বা জৈব সার ব্যবহারের উপকারিতা-

- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও মাটির গুণাগুন উন্নত হয়
- মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- মাটির বায়ু চলাচল বেড়ে যায় ও মাটির উপকারী জীবাণুর কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়
- গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমায় এবং শীতকালে মাটিকে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মাটির বিষাক্ততা কমায়।

চিত্রঃ কম্পোস্ট সার

গ. ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার তৈরিঃ ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার একটি জৈব সার যা জমির উর্বরতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। কেঁচো গোবর খেয়ে মল ত্যাগ করে এবং এর সাথে কেঁচোর দেহ থেকে বের হওয়া রাসায়নিক পদার্থ মিলিত হয়ে যে সার তৈরি হয় তাঁকে কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়।

কেঁচো সারের ব্যবহার

- কেঁচো সার সব ধরনের ফসলে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে শাক সবজি উৎপাদনে এর উপযোগিতা অত্যন্ত বেশি।
- ফুলের আকার, উজ্জলতা ও আকর্ষণীয়তা বাড়ে এবং মোট উৎপাদন বেড়ে যায়।
- শহরাঞ্চলে টবে কেঁচো সার ব্যবহারে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
- এ ছাড়া মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: কেঁচো সার

ঘ. গো-মূত্র প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার: সাধারণত ৩৫০ কেজি ওজনের একটি গরু দৈনিক ১০ থেকে ১৩ লিটার মূত্র ত্যাগ করে থাকে। দেশে বর্তমানে ১.৮৭ কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরু রয়েছে এবং এ সকল গরু প্রতিদিন প্রায় ২২.৪ কোটি লিটার গো-মূত্র উৎপাদিত হচ্ছে। গো-মূত্রে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বালাই দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই বিপুল পরিমাণ গো-মূত্রের একটি অংশ জৈব কীটনাশক সার ও বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায় এতে করে রসায়নিক সার ও কীটনাশক এর ব্যবহার হ্রাস পাবে। গো-মূত্রের শতকরা ৯৫ ভাগ পানি ২.৫ ভাগ ইউরিয়া এবং ২.৫ ভাগ খনিজ পদার্থ এনজাইম ও হরমোন রয়েছে যা উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধি এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিসহ ক্ষতিকর পোকা দমনে কার্যকরী। গো-মূত্র চার দিন রেখে গাজন করলে ক্ষতিকর এমোনিয়া অপসারিত হয় ও ইউরিয়ার উপস্থিতি বৃদ্ধি পায় যার ফলে জৈব সার হিসেবে এর ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

এক নজরে গবাদিপ্রাণির পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:

ক্র. ন.	বর্জ্য পদার্থ	বর্তমান ব্যবহার	পরিবেশগত প্রভাব	বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
০১	গোবর	শুকনা জ্বালানি হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।	প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া (কার্বন ডাইঅক্সাইড) নির্গমণ হয় যা বায়ু দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে।	• গোবর থেকে কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি করা যেতে পারে। • গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে। • বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত স্লারি কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
		ছোট ছোট গর্ত বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়।	পুকুর, নদী ও খালের পানি দূষিত হয়।	• কেঁচো সার উৎপাদন করা যেতে পারে।
		গর্ত করে সংরক্ষণ ও সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	পরিবেশের জন্য ভালো, তবে মিথেন নির্গমন হয়।	• বাণিজ্যিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার করা যেতে পারে।
		ভার্মি কম্পোস্ট	পরিবেশের জন্য ভালো।	• বাণিজ্যিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
০২	উচ্ছিষ্ট গো-খাদ্য	ছোট ছোট গর্ত বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়।	বিভিন্ন কীট পতঙ্গের বংশ বিস্তার ত্বরান্বিত করে।	• বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার
		শুকনা জ্বালানি হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।	প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া (কার্বন ডাই-অক্সাইড) নির্গমন হয় যা বায়ু দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে।	
০৩	খামার ধৌত দূষিত পানি	সরাসরি পুকুর, খাল ও নালায় ফেলা হয়	পরিবেশ দূষিত হয়	• বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার • একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। • গো-খামারের নকশায় পরিবর্তন করে গো-মূত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

০৪	গো-মূত্র	সরাসরি পুকুর, খাল ও নালায় ফেলা হয়। এছাড়া বসতভিটার আশেপাশে বিচ্ছিন্নভাবে ফেলা হয়।	পরিবেশ দূষিত হয়	• একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঢাকনাসহ সোকওয়েল করে সেখানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। • গো-মূত্র হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈব সার ও জৈব বালাই নাশক পাউডার এবং/অথবা তরল তৈরি করা যেতে পারে। • জৈব কীটনাশক হিসেবে ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। • গো-মূত্র ১০-১৪ দিন রেখে গাঁজন করে তার মধ্যে নিম ও তামাক পাতা, বিষকাঠালী ও ধুতরার নির্যাস মিশিয়ে বালাইনাশক হিসেবে প্রস্তুত করা যেতে পারে। • বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে গোবরের সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দুধের জোগান দেয়ার জন্য দুগ্ধ খামার এর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ সকল দুগ্ধ খামারের বর্জ্য পরিবেশের উপর যেন কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার গড়ে তোলা। শূন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় খামারের সকল বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে নিষ্কাশিত হয় এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে পুনর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে খামারের বর্জ্য দ্বারা পরিবেশের দূষণের কোন উপায় থাকে না। তাই খামারিদের মাঝে শূন্য বর্জ্য দুগ্ধ খামার ও পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেমন বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, কম্পোস্ট সার তৈরি, কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি ইত্যাদি প্রযুক্তি জনপ্রিয় করা সময়ের দাবি। আর এ জন্য প্রয়োজন প্রচার ও পর্যাপ্ত খামারি প্রশিক্ষণ।

পোল্ট্রি খামারে গন্ধ উৎপাদন, পরিবেশের উপর প্রভাব ও নিরসনের উপায়

ড. সাবিহা সুলতানা[১]*, ড. শাকিলা ফারুক[১] ও ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন[২]**

মুরগি পালন বাংলাদেশের একটি প্রাচীন এবং দ্রুত বর্ধনশীল খাত। এটি প্রাণিজ প্রোটিনের বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ এবং সস্তা উৎস। প্রোটিনের প্রধান উৎস মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি বর্তমানে শিল্পে পরিণত হয়েছে। পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে, দারিদ্র বিমোচন, মানুষের খাবারে মানসম্পন্ন প্রোটিনের সরবরাহ বাড়িয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। পোল্ট্রি পালনে মাংস ও ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ পোল্ট্রি লিটার বা বিষ্ঠা তৈরি হয় যা পরিবেশ দূষণের কারণ। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ৪.৫২ মিলিয়ন টন পোল্ট্রি লিটার উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে ৩.১০ মিলিয়ন টন বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার থেকে উৎপাদিত হয় (খসড়া জাতীয় নীতিমালা, ২০১৫)। সাধারণত পোল্ট্রি লিটারকে বর্জ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা বায়ু, পানি এবং মাটিকে দূষিত করে এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। লিটার সাধারণত সার, নষ্ট ফিড, বিছানাপত্র, পালক এবং আরও অনেক কিছুর একটি ভিন্নজাতীয় মিশ্রণ। প্রচলিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র খামারিরা মুরগির বিষ্ঠা কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহার করেন না, কিছু খামারি তাদের হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ফসল উৎপাদনের জন্য সার হিসেবে ব্যবহার করে এবং কেউ কেউ মাছ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে। মাঝারি খামার মালিকদের প্রায় অনেকেই মাছ উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি লিটার ব্যবহার করে এবং বড় খামার মালিকগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পোল্ট্রি লিটার বিক্রি করে। বাংলাদেশে, বেশিরভাগ ক্ষুদ্র খামারিরা তাদের মুরগি উন্মুক্ত আবাসন ব্যবস্থায় পালন করছে, ফলে খামারের মুরগির বিষ্ঠা হতে থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় (যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথাইল মারকাপটান) যা হতে তীব্র গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুরগির বিষ্ঠা থেকে গন্ধযুক্ত যৌগ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং খামারের শ্রমিক এবং আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। লিটার থেকে উৎপন্ন গন্ধ নাক, গলা এবং চোখের জ্বালা, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, ডায়রিয়া, বুকের টান, কাশি, নাক বন্ধ, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়, তন্দ্রাভাবসহ মেজাজের পরিবর্তন হতে পারে।

গন্ধ সাধারণত অপ্রীতিকর। গন্ধ একক বা উদ্বায়ী জৈব যৌগের মিশ্রণের কারণে ঘটে যা কম ঘনত্বে উপস্থিত থাকে এবং মানুষ এবং প্রাণী তাদের গন্ধের অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে। বেশিরভাগ গন্ধযুক্ত পদার্থগুলি শিল্প ও কৃষি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় যা বেশ কয়েকটি গন্ধ বা গন্ধযুক্ত রাসায়নিক যৌগের জটিল সংমিশ্রণ। গন্ধের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের যৌগ- অজৈব পদার্থ: অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, অ্যাসিড: অ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপিওনিক অ্যাসিড, অ্যামাইনস: মিথাইল অ্যামাইন, ইথাইল অ্যামাইন, মারকাপটানস: অ্যালিল মারকাপটান, অ্যামাইল মারকাপটান। বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন গন্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী যা মানব স্বাস্থ্যের ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। দুর্গন্ধ পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি প্রধান সমস্যা। এটি পোল্ট্রি লিটারের সঠিক ব্যবহারে একটি বাধা। পোল্ট্রি খামার হতে নির্গত গন্ধ আশেপাশের জনবসতি এলাকায় বিরুপ প্রভাব ফেলে, যা অনেক সময় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। গন্ধ এমন পদার্থ যা মানুষের ঘ্রাণশক্তিকে উত্তেজিত করে। ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে এমোনিয়া প্রধান হলেও ডিম পাড়া মুরগির ক্ষেত্রে, অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) হল দুটি প্রধান গন্ধ দূষণকারী গ্যাস। এমোনিয়া হল একটি অদৃশ্য, জলে দ্রবণীয় ক্ষারীয় গ্যাস যা অন্যতম প্রধান দূষক হিসাবে স্বীকৃত, এবং এমোনিয়া এর ঘনত্ব ২৫ পিপিএম-এর বেশি হলে তা মুরগির শ্লেষ্মা এবং শ্বাসনালীকে উদ্দীপিত করতে পারে, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং তাপজনিত রোগ হয়। অন্যদিকে হাইড্রোজেন সালফাইড যার একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'পচা ডিমের' গন্ধ রয়েছে, এটি প্রধান বিষাক্ত গ্যাসগুলির মধ্যে একটি। হাইড্রোজেন সালফাইড এর নির্দিষ্ট ঘনত্বে মুরগির সংস্পর্শে লিভার, প্লীহা এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং ইমিউন সিস্টেমের ক্ষতির হতে পারে। হাইড্রোজেন সালফাইড-এর ২০ পিপিএম-এর বেশি হলে ফলে মুরগির মধ্যে বার্সা, প্লীহা এবং থাইমাসের সক্রিয় প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া এবং ওজন হ্রাস হতে পারে।

* ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা[১], প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা[১], পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, **মহাপরিচালক[২], বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষনা ইনষ্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

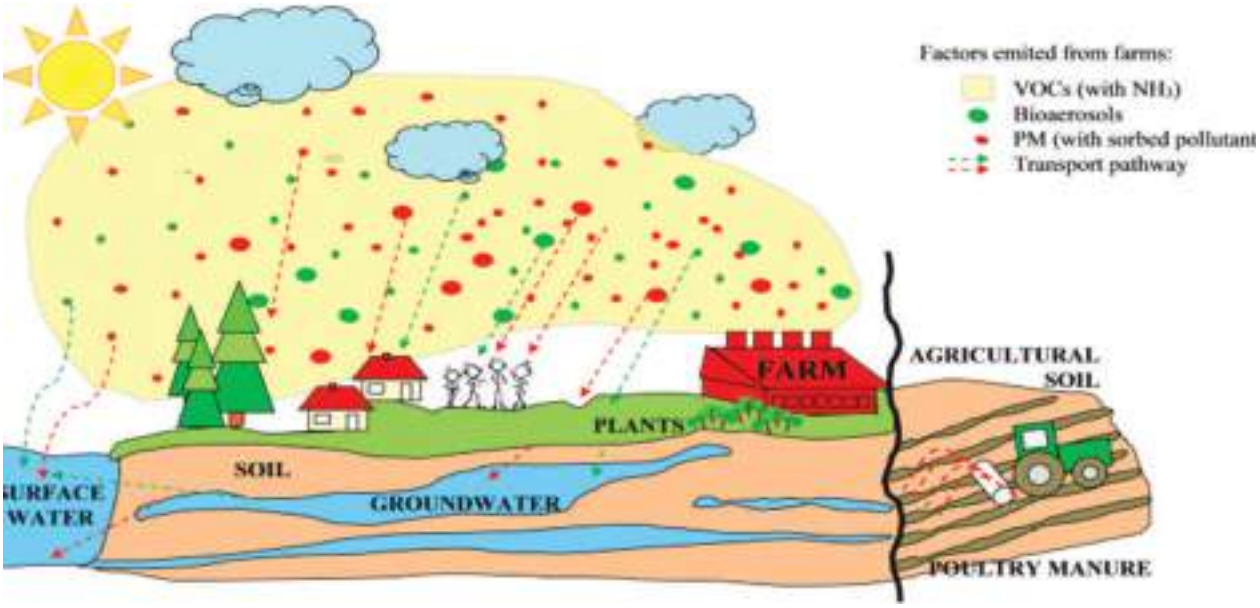

চিত্র: পোল্ট্রি খামারে নির্গত ক্ষতিকর উপাদান হতে পরিবেশ দূষণ

প্রচলিত পোল্ট্রি ডায়েটে নাইট্রোজেন-এর এক-তৃতীয়াংশ মুরগির টিস্যু ও ডিমে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিক এসিড এবং অপাচ্য বর্জ্যে প্রোটিন হিসেবে নিঃসৃত হয়। হাইড্রোলাইসিস, খনিজকরণ এবং উদ্বায়ীকরণের মাধ্যমে, ইউরিক অ্যাসিডের নাইট্রোজেন দ্রুত এমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। নাইট্রোজেন নির্গমন মুরগির খাদ্য এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণগুলি যেমন আর্দ্রতার মাত্রা এবং পিএইচ ব্যালেন্সকে প্রভাবিত করে। পোল্ট্রিতে অতিরিক্ত প্রোটিন অ্যামিনো এসিড খাওয়ানোর ফলে নাইট্রোজেন নির্গমন হতে পারে। নাইট্রোজেন নিঃসরণ কমানোর সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল ডায়েট ফর্মুলেশন ব্যবহার করা, যার খাদ্যের অপরিশোধিত প্রোটিনের মাত্রা কম এবং অ্যামিনো এসিডের ঘনত্ব বেশি। খামারে পালিত মুরগির খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করে দুর্গন্ধের পরিমাণ কমানো যেতে পারে। পুষ্টির কৌশল হিসেবে পোল্ট্রি রেশনে সয়াবিন এর আংশিক প্রতিস্থাপন, কম প্রোটিন বা কম সালফারের খাদ্যে ব্যবহার লিটারে গন্ধ কমাতে পারে। পোল্ট্রি ফিডে সরবরাহ করা সমস্ত প্রোটিন মুরগি হজম করতে পারে না। উদ্বায়ী জৈবযৌগ (VOCs), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), অ্যামোনিয়া (NH_3), গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। লিটারের অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিবেশগত, সামাজিক ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে অন্যদিকে লিটার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য উপকারী হতে পারে।

পোল্ট্রি লিটার হতে গন্ধ নিরসনের কার্যকরী উপায় নিরুপনে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউটে (বিএলআরআই) গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যকরী উপায়গুলোর মধ্যে:

১) উৎপাদন ঠিক রেখে পোল্ট্রি খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে গন্ধ কমানো

২) পোল্ট্রির বিষ্ঠায় উৎপাদিত অ্যামোনিয়ার মাইক্রোবিয়াল ডাইজেশনের মাধ্যমে গন্ধ কমিয়ে আনা

এছাড়া, আরও অনেকগুলো পন্থা অবলম্বন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিগণ পোল্ট্রি সেডে গন্ধ উৎপাদনকারী গ্যাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে:

ক) পোল্ট্রি রেশনে সালফারযুক্ত অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণ কমিয়ে পোল্ট্রি লিটারে গন্ধ উৎপাদনকারী গ্যাসের (মিথাইল মারক্যাপটেন, হাইড্রোজেন সালফাইড) পরিমাণ কমানো যায়।

খ) পোল্ট্রি রেশনে ফাইটেজ এনজাইম ব্যবহারের মাধ্যমে লিটারে গন্ধ উৎপাদনকারী গ্যাসের পরিমাণ কমানো যায়।

গ) মুরগির পুষ্টির প্রকৃত চাহিদা নিরুপন করে, উচ্চ হজমযোগ্য খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে ও ফেজ ফিডিং (বয়স অনুসারে পুষ্টির চাহিদা নিরুপন করে) রেশন তৈরি করলে পুষ্টি উপাদানগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হবে, এতে গন্ধ উৎপাদনকারী গ্যাসের পরিমাণ কম হবে।

ঘ) খাদ্যের প্রস্তুতের বিভিন্ন আকারের (পিলেট, ক্রাম্বল, ম্যাস) মধ্যে পিলেট আকারে খাদ্য সরবরাহ করলে মুরগির হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ফলে বিষ্ঠার আর্দ্রতা কম হয়, তাই গন্ধ উৎপাদনকারী গ্যাসের পরিমাণ কম হবে।

ঙ) এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোল্ট্রির বিষ্ঠা হতে উৎপাদিত গ্যাসের দুর্গন্ধ দুরীকরণে সাম্প্রতিক সময়ে activated carbon, silica gel, Zeolite, Aqua ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। লিটারে আর্দ্রতা শোষণ করে ভোলাটাইল অরগানিক কম্পাউন্ড উৎপাদন হ্রাস করে ফলে দুর্গন্ধ কম হয়।

চ) পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উত্তম চর্চার মাধ্যমে কম্পোস্ট সার তৈরি, বায়োগ্যাস, বিদ্যুত ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ছ) পোল্ট্রি সেডে বিশেষ করে লেয়ার সেডে লিটার পরিষ্কারের পর সেডের ভিতরে ও লিটার ফেলার গর্তে চুন ছিটিয়ে গন্ধ কমানো যাবে।

পোল্ট্রি খামারে গন্ধ দুরীকরণে সঠিক বাসস্থান নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের চলাচল, লোকালয় হতে দূরে অবস্থান, এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে। কাজেই এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা সম্পন্ন হলে গন্ধ দুরীকরণের সমন্বিত মডেল উদ্ভাবন ও প্রতিকার করা যাবে, যা এই শিল্পের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে, একদিকে যেমন পোল্ট্রি খামারের গন্ধ নিবারণের পাশাপাশি উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

২৮তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP28)-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

মির্জা শওকত আলী*
মোঃ হারুনুর রশীদ**

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় বিগত ৩০ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে ২৮তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP28) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি-এর নেতৃত্বে ৩৩ সদস্যের একটি ছোট কিন্তু দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, Loss & Damage, Climate Finance এবং Mitigation-সহ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জোট LDC Group-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

উক্ত সম্মেলনে ১-২ ডিসেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত High-Level Segment-G 130টিরও অধিক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনে ৯-১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত Resumed High-Level Segment-এ বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী Country Statement প্রদান করেন। উক্ত Country Statement-এ তিনি নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তুলে ধরেন:

(১) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য মাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে; এজন্যে প্রধান-প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশসমূহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

(২) প্রথম গ্লোবাল স্টকটেককে অবশ্যই ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বর্ধিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য নির্দিষ্ট মাইলফলক প্রদান করতে হবে।

(৩) অধিক ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশসমূহে NAPs এবং NDCs বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক public source-কে প্রাধান্য দিয়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান করতে হবে।

(৪) উন্নত দেশগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান নিশ্চিত করা; জলবায়ু অর্থায়ন-এর সংজ্ঞা চূড়ান্ত করা; ২০২৫ পরবর্তী সময়ের জন্য New Collective Quantified Goal on Climate Finance আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা।

চিত্র-১: কপ-২৮ সম্মেলনের High-Level Segment-এ বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি Country Statement প্রদান করেন।

* পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ** উপপরিচালক-পরিবেশ অধিদপ্তর।

চিত্র-২: কপ-২৮ সম্মেলনে লস এন্ড ড্যামেজ, জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রশমনসহ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি-কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

COP28 Presidency, UAE-এর নেতৃত্বে UNFCCC-ভূক্ত ১৯৭টি পার্টি বা সদস্য রাষ্ট্র প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর নির্ধারিত সময়ের একদিন পরে ১৩ ডিসেম্বরে UAE Consensus গ্রহণে ঐক্যমতে পৌছেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় COP28-এ গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- দুবাই জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের প্রথম দিনেই উদ্বোধনী প্লেনারির সময়, ইতিপূর্বে COP27-এ প্রতিষ্ঠিত নতুন Loss and Damage Fund কার্যকর (operationalize) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত তহবিলে জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারসহ এ পর্যন্ত ১৯টি দেশ মোট ৭৯২ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নতুন তহবিলটি প্রাথমিকভাবে চার বছরের জন্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- ইউএন অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং ইউএন অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস-এর কনসোর্টিয়াম Santiago Network on Loss and Damage-এর হোস্ট হিসেবে কাজ করবে।
- পার্টিসমূহ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ সে.-এর মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গভীর, দ্রুত এবং টেকসইভাবে গ্রীণহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে GST-তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি সদস্য দলগুলিকে তাদের পরবর্তী NDC-কে আরো উচ্চাকাঙ্খী করে অর্থনীতি-ব্যাপী, সকল সেক্টরকে কভার করে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ সে.-এ সীমাবদ্ধ রাখার সাথে সংগতি রেখে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে এবং ন্যায্য, সুশৃঙ্খল এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে জীবাশ্ম জ্বালানি পরিহারের আহবান জানানো হয়েছে।
- দুই বছর মেয়াদী Glasgow–Sharm el-Sheikh Work Programme on the Global Goal on Adaptation-এর কার্যক্রম শেষ করে অভিযোজন বিষয়ে বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ, এটি অর্জনের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সামগ্রিক অগ্রগতির পর্যালোচনার লক্ষ্যে UAE Framework for Global Climate Resilience গ্রহণ করা হয়েছে যার লক্ষ্য হবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল প্রভাব, ঝুঁকি এবং দুর্বলতা হ্রাস করা, সেইসাথে অভিযোজনমূলক কার্যক্রম এবং সহায়তা বৃদ্ধি করা।
- Work Programme on Just Transition Pathways-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যার আওতায় দুটি বার্ষিক অধিবেশনের আগে Just Transition বিষয়ে কমপক্ষে দুটি Hybrid Dialogue এবং Annual High-Level Ministerial Round Table অনুষ্ঠিত হবে।
- Low GHG emissions এবং climate-resilient development পথের সাথে জলবায়ু অর্থায়ন প্রবাহ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ ২.১(সি)-এর পরিধি এবং এর পরিপূরক জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৯ এর উপর সংলাপ, মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য এবং বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ২৯টি সাইড-ইভেন্ট আয়োজনসহ বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র-৩: ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জাপান প্যাভিলিয়নে আয়োজিত একটি সাইড ইভেন্টে বক্তব্য প্রদান করছেন।

আরো উল্লেখ্য যে, এবারের কপ-২৮ সম্মেলনের সাইডলাইনে ১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে জলবায়ু বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নেতৃস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "Climate Mobility Champion Leader Award"-এ ভূষিত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপের কাছ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ও বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি, এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও বাংলাদেশকে Global Center on Adaptation (GCA) কর্তৃক "Innovation in Devolving Finance" বিভাগে "GCA Local Adaptation Champions Award" প্রদান করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং উদ্ভাবনের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

চিত্র-৪: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ পাঁচজন কর্মকর্তা কপ-২৮ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

এবারের সম্মেলনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ পাঁচজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ পজিশন পেপার প্রণয়নসহ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে স্বল্পোন্নতদেশসমূহের জোট LDC Group সাধারণত জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে। বরাবরের মত এবারের সম্মেলনেও LDC Group এবং G77&China Group -এর পক্ষে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা পালন করেছে।

সবুজ অর্থনীতি

আবুল কালাম আজাদ*

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রকৃতির সঙ্গে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনীতির এ নবধারণা 'সবুজ অর্থনীতি' নামে পরিচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সবুজ বিনিয়োগ ও সবুজ ব্যাংকিংয়ের মডেল। পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে কীভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, সেটিই সবুজ অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এসব ধারণা এরই মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে বাংলাদেশে সবুজ অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি তৈরি হলেও কাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ব্যাপক হারে। এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতেও।

সবুজ অর্থনীতি (Green Economy):

'সবুজ অর্থনীতি' শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্য সরকার নেতৃস্থানীয় পরিবেশগত অর্থনীতিবিদদের দ্বারা 'Blue Print' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, যেখানে সবুজ অর্থনীতির ধারণাটি সর্বপ্রথম সংযোজিত হয়। 'সবুজ অর্থনীতি' এটি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে (দেশ, শহর, ব্যবসা, সম্প্রদায়, ইত্যাদি) ব্যবহৃত উৎপাদন পদ্ধতির (ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি এবং পরিষেবা) একটি সংগ্রহ, যা সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে পারে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে না এমন অর্থনৈতিক উন্নয়নই সবুজ অর্থনীতি। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)-এর মতে, সবুজ অর্থনীতি হল 'পরিবেশগত ঝুঁকি এবং পরিবেশগত ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার সাথে সাথে মানুষের মঙ্গল এবং সামাজিক সমতাকে উন্নত করে'। আরও সহজভাবে বলা যায়, সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি, যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে কিন্তু একই সঙ্গে পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে। এটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত, যা সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশগত গুণমান সংরক্ষণে অবদান রাখে। সবুজ অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামাজিক কল্যাণ উন্নত করা, প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার কমিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, শক্তি দক্ষতা প্রচার, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে দারিদ্র্য হ্রাস করা। কার্ল বারকার্টের মতে, সবুজ অর্থনীতি ৬টি খাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন: নবায়নযোগ্য শক্তি, সবুজ ভবন, টেকসই পরিবহন, পানি ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও 'সবুজ উন্নয়ন'-এর ক্ষেত্রে ৬টি কৌশলগত স্তর রয়েছে। যেমন: জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বৃত্তাকার অর্থনীতি, পরিবেশ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার, পানি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ।

বাংলাদেশে সবুজ অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা

বিগত জুন ২০২২ এ 'ক্রিয়েটিং আ গ্রিন অ্যান্ড সাসটেইনেবল গ্রোথ পাথ ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, পরিবেশের অবনমনের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশ ৬৫০ কোটি ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ২৮% সংঘটিত হয় পানি এবং বায়ু দূষণের কারণে। এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্সের (ইপিআই) বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বাধিক দূষিত ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRC) প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ডিজেস্টারস রিপোর্ট-২০১৮' অনুসারে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ১৯৮০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ৪২৯টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বন্যা, ভূমিধস, টর্নেডো, ট্রপিক্যাল সাইক্লোন, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

শিল্পায়নের জোয়ারে বাংলাদেশের কৃষি খাতের দিক থেকে মনোযোগ সরে গেছে। অথচ এ দেশের মোট কর্মক্ষম জনগণের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ কৃষি খাতে জড়িত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির মাত্র ১১.২০ শতাংশ কৃষি খাত থেকে, ৩৭.৫৬ শতাংশ শিল্প খাত হতে এবং ৫১.২৪ শতাংশ সেবা খাত হতে আসে। একটি গতিশীল অর্থনীতি নির্মাণে শিল্প ও সেবা খাতের প্রয়োজন আছে। সে কারণে কৃষি খাতকে অবহেলা করা যাবে না। শিল্প ও সেবা খাতের সঙ্গে কৃষি খাত যদি

*সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট), পিকেএসএফ।

সুষমভাবে এগিয়ে গিয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তা সবুজ অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। সবুজ অর্থনীতির ধারণা অনুসারে, প্রকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, অনেক সময় সাদা চোখে তা ধরা যায় না। তবে যখন তা বোঝা যায়, ততদিনে আর কিছু করার থাকে না। বাংলাদেশের প্রধান নগরগুলোয় শিশু-কিশোরদের খেলার মাঠগুলোতে গড়ে উঠেছে বহুতল আবাসিক ভবন কিংবা শপিং মল। খেলাধুলা চর্চা ব্যাহত হওয়ায় এবং শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন সুষমভাবে বিকাশিত হতে না পারায় তারা মানসিক জটিলতা নিয়ে বড় হচ্ছে। তারা দেশের স্বার্থে অবদান রাখার মতো উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে অন্তত দু' দিক দিয়ে। প্রথমত, এসব বিপথগামী ও মানসিক জটিলতাগ্রস্ত শিশু-কিশোরদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের পেছনে রাষ্ট্রের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানসিক বিপর্যস্ততার কারণে পরিণত বয়সে তারা দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। আমাদের নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারাচ্ছে। জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, আবাসিক এলাকা ও রাস্তাঘাট। সারা শহরের শিল্প-কারখানা এবং আবাসিক এলাকার যাবতীয় বর্জ্য গিয়ে নদী ও খালগুলোকে কলুষিত করছে। আমাদের প্রধান নগরগুলোর রাস্তাঘাট বর্ষায়/অতিবৃষ্টির ফলে পানিতে ডুবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে, যা নিরসনে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে জলাশয়গুলো ভরাট হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতি জড়িত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ উভয়ই একটি দেশের জন্য অপরিহার্য। দেশকে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে সবুজ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নেই। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ঝুঁকিতে থাকা অন্যতম দেশ হওয়ায় দেশে সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা রয়েছে তার সমাধান অতীব জরুরি।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার সুবজ অর্থনীতি

বিগত চার দশকে একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার পেছনে আমাদের যে যাত্রা তার মূলে রয়েছে শিল্পের বিকাশ, বিশেষ করে শ্রমনির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নেও গার্মেন্টস খাত অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের ট্র্যাজেডি থেকেই পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপনের বিষয়টি আলোচনায় আসে। এরপরই বাংলাদেশে সবুজ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। প্রায় আট বছরে দেড় শতাধিক সবুজ কারখানা গড়ে উঠেছে। এর বাইরে আরও অন্তত ৫০০টি সবুজ কারখানা গড়ে উঠেছে। যারা সনদের অপেক্ষায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) নামের সংস্থাটি সারা বিশ্বের সবুজ শিল্পের সনদ দিয়ে থাকে। এ সংস্থার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি সবুজ কারখানার ৩৯টি বাংলাদেশে স্থাপিত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫০টি সবুজ কারখানা রয়েছে। এরমধ্যে ৪১টিই সবুজ কারখানা হিসেবে প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে। ক্রম পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে শিল্পের ভূমিকার বিষয়টিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় পরিবেশ ও জলবায়ুর বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

গ্রিন ইকোনমির জন্য দেশে ২০১১ সালে বাংলাদেশ গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালার আলোকে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদার করা হলেও বাংলাদেশে এটা আজও প্রত্যাশিত অবস্থানে পৌঁছতে পারেনি। গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংক আলাদাভাবে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম তদারকি এবং যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে দেশে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আরও সচেতন সুদৃঢ় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গ্রিন ইকোনমির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে-পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প ও ব্যবসায় ঋণ প্রদান কমানো অথবা একেবারেই ঋণ প্রদান না করা, মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা অধিকাংশ পরিবেশবান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় বিনিয়োগ করা, পরিবেশবান্ধব পণ্য উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত পণ্য উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়ন, গ্রিন ফাইন্যান্সের আওতায় পরিবেশগত অবকাঠামোসহ অন্যান্য পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন। যেমন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প, দূষিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প, বায়োগ্যাস প্রকল্প, জৈবসার প্রকল্প, বনায়ন প্রভৃতি। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পে অর্থায়ন করার ব্যাপারে সব মহলকে তৎপর হওয়াই গ্রিন ইকনোমির মূল প্রতিপাদ্য বিবেচনা করতে হবে। সবুজ অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে পরিবেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংবেদনশীল সেক্টর ও অন্যান্য প্রকল্পে আলাদা নীতিমালা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবস্থা (পোল্ট্রি ও ডেইরি), কৃষি খামার, ট্যানারি, মৎস্য চাষ, চিনি শিল্প ও হাউজিং, রাবার বাগান ও শিল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর বিশেষ কর্মপন্থা প্রণয়ন করতে হবে। একইভাবে গার্মেন্টস শিল্পে গ্রিন ফ্যাক্টরি ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেবে। গ্রিন ফ্যাক্টরি কার্যক্রমকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ ক্ষেত্রে চমৎকার গতির সঞ্চার হবে। সবুজ বিনিয়োগ এখন শুধু তৈরি পোশাক খাতে সীমাবদ্ধ নেই বরং প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল খাতেও সবুজ বিনিয়োগ বাড়ছে। এ খাতে বর্তমানে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। তবে সবুজ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহ এখনো অনেক কম হওয়ায় এ খাতে বিনিয়োগে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সবুজ অর্থায়নে যুব সমাজ ও সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশে সবুজ অর্থনীতিতে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে। কারণ যুব সমাজই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতির গুরুত্ব জণসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সবুজ অর্থনীতির স্লোগান দিনে দিনে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরিবেশবান্ধব শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে এখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশের সরকার সবুজ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা খুবই ইতিবাচক। ইটভাটা থেকে বায়ু দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে পুরনোইটভাটা গুলোকে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে নির্দেশনা প্রদান করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি আইন অনুমোদন করাসহ সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন করা, নবায়নযোগ্যজ্বালানির বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর প্রথম পাঁচ বছর আয়কর মওকুফ করাসহ জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের আগ্রহী করতে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সবুজ বিনিয়োগ এবং সবুজ ব্যাংকিংয়ের ধারণা সরকারিভাবে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেসব শিল্প-কারখানা যথাযথ পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করছে, তাদেরকে কর রেয়াতের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলো যেন পরিবেশ দূষণকারী কোনো কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ না করে, সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা পরিপালিত হচ্ছে। তবে সবুজ অর্থনীতিকেন্দ্রিক এসব নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে শ্লথ গতি রয়েছে, যা কাম্য নয়। বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি এবং ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটায় এখন এ বিষয়ে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য সবুজ অর্থনীতির নানা কর্মকৌশল কার্যকর ও সুফলদায়ক প্রমাণিত হওয়ায় এখন বাংলাদেশও এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। যে সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে বরং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় সেগুলোকেই গ্রিন ইকোনমিতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরি।

চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

সবুজ অর্থনীতির ধারণা ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণে জনসচেতনা, এতদবিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অভাব, কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামো ও বিনিয়োগ ঘাটতি, রাজনৈতিক চাপ, সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি পরিপালন করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরিবেশকে বিরূপ না করে উন্নয়ন কার্যক্রম চালাতে সবুজ অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে এরই মধ্যে জড়িত হয়েছে বাংলাদেশ। তদুপরি পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপীই তুলনামূলক কম কার্বন নিঃসরণ করে পরিবেশকে রক্ষা করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই পৃথিবীবাসীর জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাই অপরিকল্পিত শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব হতে সাধারণ মানুষক ও পরিবেশকে বাঁচাতে সবুজ কারখানা গড়ে তুলতে হবে। টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে সবুজ শিল্পায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ব্যবসায়িক দিক না দেখে বরং পরিবেশের কথাও ভাবতে হবে। এ খাতে সরকারের নীতিগত সহায়তা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া তৈরি পোশাকশিল্পের বাইরেও যে গ্রিন ফ্যাক্টরি রয়েছে, সেগুলোর দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য সারা বিশ্বই এখন গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট ও সাসটেইনেবল বিজনেসের দিকে ঝুঁকছে। গ্রিন ব্যাংকিংকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সবুজশিল্পের প্রসার ছাড়া পরিবেশ রক্ষা করা কঠিন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী মানুষের জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

উপসংহার

সবুজ অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সহায়ক উপাদান হিসেবে ইতোমধ্যেই বিবেচিত হচ্ছে, যা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, অবহেলিত দুর্যোগপূর্ণ জনপদের উন্নয়ন, কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রিন ইকোনমির কর্মকান্ড আমাদের জনজীবনে অনুকূল প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই সবুজ অর্থনীতি এখন দেশে দেশে জনপ্রিয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতি নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ক্রমেই আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। মাথাপিছু আয় বাড়ছে, গড় আয়ু বাড়ছে। জীবনমানেরও উন্নতি হচ্ছে। ফলে নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে সবুজ অর্থনীতির কার্যকারিতা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। সমাজের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সকলকে উপলব্ধি করতে হবে যে, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবুজ অর্থনীতি শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশকে বাসযোগ্য রাখতে সবুজ অর্থনীতির বিকল্প নেই। সুতরাং সবুজ অর্থনীতি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি স্তর থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে।

নগর কৃষি ও অক্সিজেন ব্যাংক

আহসান রনি*

...কিছু একটা নিয়ে ভাবছিলাম, হঠাৎ রিকশার ক্রিং ক্রিং শব্দে সম্বিত ফিরে পেলাম। রাস্তার পাশের স্কুলটার দিকে তাকাতেই দেখলাম শিক্ষার্থীরা ভবনের নিচতলার ফ্লোরে সাড়িবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অ্যাসেম্বলি করছে। মুহূর্তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমাদের সময় স্কুলগুলো ছিল বিস্তৃত মাঠ আর বৃক্ষরাজিতে ঘেরা অথচ আমাদের সন্তানকে আমরা স্কুলে এসেম্বলি করার জায়গাটুকুও দিতে পারছিনা। গাছের আধিক্য থেকেই হয়তো ঢাকা শহরের অধিকাংশ এলাকাকে গাছের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। অথচ, কলাবাগান, জিগাতলা, গাবতলী, তালতলা, খেজুর বাগান, সেগুনবাগিচা, কাঁঠাল বাগান, লিচু বাগান, আম বাগান, কমলাপুর, কদমতলী, নীলক্ষেত, নিমতলী, জামতলী এর কোনটিই তার নামকরণের ঐতিহ্যকে ধারণ করতে পারেনি। ছোটবেলায় কোন সুস্বাদু ফল খেলেই আঁটি বা বীচিটা উঠোন বা স্কুলের আঙিনায় পুঁতে রাখতাম। নিজের হাতে লাগানো এমন অসংখ্য গাছ এখনো পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে প্রকৃতির শোভা বাড়াচ্ছে। অথচ এ সময়ে এসে কোন পার্কের সুবিশাল বৃক্ষগুলোকে দেখিয়ে যখন আমাদের সন্তানেরা প্রশ্ন করে এত বড় বড় গাছগুলো কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা এত বিশাল বিশাল গাছ এখানে কিভাবে লাগানো সম্ভব হয়েছে তখন আমরা তাকে উল্টো প্রশ্ন করি যে, এটা তুমি তোমার পাঠ্যবইতে পড়নি? আমরা তখন ভুলেই যাই যে, এটা বই থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নয় বরং এটাই প্রজন্ম শিক্ষা বা জেনারেশন লার্নিং যা আমরা নিজ নিজ পরিবার ও পারিপার্শ্বিক বলয় থেকে শিখেছি। আমি আমার মাকে দেখেছি কি চমৎকার কৌশলে সন্ধ্যাবেলা এক ঝাঁক হাস মুরগীকে এক এক করে খুপিতে তোলে, দেখেছি কিভাবে মায়ের হাতে লাগানো কুমড়ো গাছটি তিন পাতা পাঁচ পাতা করে বাড়তে বাড়তে একসময় পুরো ঘরের চালকে ছেয়ে ফেলে, কত সুন্দরভাবে কুমড়ো ফুল ফুটে থাকে, গাছে ঝুলে থাকা কোন লাউ বা কুমড়োটি খাওয়ার উপযোগী হয়েছে তা আমাদের মায়েরা বা নানি দাদিরা যেভাবে বুঝে ফেলতেন এর সবই প্রজন্ম শিক্ষা যা কখনই পাঠ্যবইয়ে লিপিবদ্ধ থাকে না কারণ এই জ্ঞান বা শিক্ষাগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। ফলে শহরে বেড়ে ওঠা শিশুদের মধ্যে এই প্রজন্ম শিক্ষার অভাবটা বেশ প্রকট হচ্ছে। এর ফলে তারা জানতে পারছেনা কোন গাছে কোন ফুল বা ফল ধরে, সিম না করলা ভর্তি কোন গাছের মাচার দিকে তাকালে কি এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের অনুভূতি তৈরি হয় মনে, যে ডালিম বা আনার তারা খায় সে ডালিম ফুলের অকৃত্রিম কারুকার্য দেখার সুযোগ বা উপলক্ষ কোনটাই তারা পায় না। তাদের অধিকাংশের অবসর কাটে টিভি কার্টুন দেখে বা কম্পিউটারে গেমস খেলে। ফলে প্রকৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসাবোধ তৈরি হয় না। এজন্য তারা বাসাবাড়ি বা বিদ্যালয়ে টবে সাজিয়ে রাখা কোন গাছের পাতা ছিড়তে বা ডাল ভাঙতে আনন্দ অনুভব করে। তাই নগর কৃষি নিয়ে কাজ করা অগ্রজ প্রতিষ্ঠান গ্রিন সেভার্স তাদের ছাদ বাগান কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকে শুরু করে বিদ্যালয় বাগান কার্যক্রম। নগরকে সবুজে সাজাতে ২০১০ সাল থেকেই গ্রিন সেভার্স এর হাত ধরে যাত্রা শুরু করে নগর কৃষি ও ছাদ বাগান উদ্যোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মেধাবী শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মাত্র কয়েক বছরেই ঢাকার প্রায় হাজার খানেক বাড়িতে গড়ে দেয় ছাদ বাগান এবং ছাদ বাগানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখার জন্য বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ঐ পরিবারগুলোর শিশু ও বয়স্ক সদস্যদের সম্পৃক্তকরণের কাজ শুরু করে এবং আশানুরুপ সাড়া পায়। এর ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয় বাগানেও যাতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থাকে, অংশীদারিত্ব থাকে এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় এ জন্য গ্রিন সেভার্স বিদ্যালয়সমূহে চালু করে এক অভিনব উদ্যোগ যার নাম অক্সিজেন ব্যাংক। শিশুদের অবুঝ মনে সবুজের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দ্রুতই সাফল্যের মুখ দেখে মহতী এই উদ্যোগটি।

ঢাকা শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হয়তো বিস্তৃত খেলার মাঠ, অঙ্গণ বা প্রাঙ্গণ খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু এ শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্ততো হাজার খানেক নিজস্ব ভবন রয়েছে। এসব ভবনের ছাঁদে গড়ে উঠতে পারে বিদ্যালয় বাগান। আর একটি অক্সিজেন ব্যাংক স্থাপনের মাধমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে সহজেই একদিকে যেমন বিদ্যালয় বাগান গড়ে তোলা সম্ভব অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিয়মিত বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে বাগানকে টিকিয়ে রাখা, সারাবছর বাগানকে সতেজ রাখা, এবং ধীরে ধীরে বাগানের পরিসর বাড়ান সম্ভব। অক্সিজেন ব্যাংক একটি আনুমানিক ১ ঘনফুট আয়তনের কাঠের বাক্স যেটি বিদ্যালয়ের দেয়ালের কোন দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিনের পয়সার একটি অংশ এখানে জমাতে পারে এবং প্রতি মাসে জমানো অর্থ দিয়ে ঐ বিদ্যালয়েই বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষ পরিচর্যা, বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পরিবেশ সচেতনতামূলক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজে অথবা অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্য থেকে পরিবেশ সচেতন একজন শিক্ষককে এই ব্যাংকের দায়িত্ব প্রদান করেন যাকে বলা হয় গ্রিন আম্বাসাডার (Green Ambassador), যিনি এই ব্যাংকের চাবি সংরক্ষণ করেন এবং মাস শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যাংক খুলে জমানো অর্থ দিয়ে উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অক্সিজেন ব্যাংকের স্লোগান হল, "জমাবো পয়সা লাগাবো গাছ, সবুজ রাখবো চারপাশ"। কারণ আমরা প্রকৃতি থেকে

*প্রতিষ্ঠাতা, গ্রিন সেভার্স

ফ্রি অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে আছি। অন্যদিকে হাসপাতালে ভর্তি একজন রোগীকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে প্রতি ঘন্টায় বিল গুনতে হয়। আর গাছ হলো সেই উপকারী বন্ধু যা বায়ুমণ্ডলে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান দেয় এবং আমরা সুস্থভাবে জীবনধারণ করি। সুতরাং প্রতিটি গাছ হলো এক একটি অক্সিজেন ফ্যাক্টরি যা আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। এছাড়াও গাছ বায়ুবলয় থেকে অতিরিক্ত কার্বণ-ড্রাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয় যা আমাদের বাসভূমিকে হিট আইল্যান্ড বা মরুভূমি সদৃশ একটি উত্তপ্ত ভূখণ্ডে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সুতরাং প্রতি মুহূর্তে আমরা যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং যতটুকু কার্বন ত্যাগ করি এর ভারসাম্যও নিশ্চিত করে গাছ। আর এই চিন্তাকে ধারণ করে ২০১১ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরের অন্তত ২০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রিন সেভার্সের মাধ্যমে অক্সিজের ব্যাংক উদ্যোগটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। ঢাকার অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অক্সিজেন ব্যাংক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাঁদে বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সবুজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারছে, নিজেরে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা গাছগুলোর প্রতি তাদের একধরণের অংশীদারিত্ব তৈরি হচ্ছে ফলে তারা গাছগুলোকে সযত্নে বড় করে তুলছে, গাছ চিনতে পারছে, গাছের বেড়ে ওঠা কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করছে, বাগানে বসে কৃষি শিক্ষা ও উদ্ভিদবিদ্যার ব্যাবহারিক ক্লাস করতে পারছে, দলবদ্ধ হয়ে বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে ফলে প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি তাদের একধরণের দরদ সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে সবুজের প্রতি যে আগ্রহ ও ভালোবাসা জাগ্রত হচ্ছে তা তাদের পরিবারেও সংক্রামিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে পারিবারিক পর্যায়ে নগর কৃষির চর্চা আরম্ভ হয়েছে অনেক শিক্ষার্থীর পরিবারে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন সেভার্সের সহায়তায় ছাঁদে সবজি চাষ করে বেশ সফল। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিদ্যালয় বাগান থেকেই বিষমুক্ত ও টাটকা সবজি কিনতে পারছে যে অর্থ পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নমূলক নানা কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। আর এভাবেই অক্সিজেন ব্যাংক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে নিজেদের নিবিড় পরিচর্যায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলছে একেকটি বিদ্যালয় বাগান।

কবিতা ও ছড়া

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে শ্রেষ্ঠ আরিহা মারিয়াম মহসিনের আঁকা চিত্র।

কাব্যকথার সেই ছবিটি

পাশা মোস্তফা কামাল

গল্পগাথায় কাব্যকথায় যে ছবিটি আঁকি
স্বপ্নে ঘুমে যে ছবিটি বুকের ভেতর রাখি।

দুচোখ ভরে স্বপ্ন ঝরে স্বপ্নঘোরে থাকি
ঝিলের জলে শাপলা ভাসে গাছে দোয়েল পাখি।

সবুজ ঘাসে শিশির হাসে ঝিম ধরেছে বক
কচিপাতায় ফড়িং নাচে, নাচা যে তার শখ।

নীল আকাশে ডানা মেলে যায় উড়ে গাঙচিল
বর্ষা জলে টইটুম্বুর শাপলা ফোটা বিল।

এই যে ছবি বন বনানী ভরা নদীর কূল
সবুজ শ্যামল রূপের শোভা দুই তীরে কাশফুল।

এই যে ছবি চোখ জুড়ানো মধুর পরিবেশ
রক্ষা করেই সামনে চলুক আমার বাংলাদেশ।

.....

পাশা মোস্তফা কামাল
ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক
প্রধান সম্পাদক, ঝুমঝুমি।

উপপ্রধান তথ্য অফিসার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ০১৮১২-২৮৫০৫৬

এক মাছরাঙ্গা

খন্দকার মাহমুদ পাশা

সহজীয়ার দলের মত আমি শুধু গেয়ে চলতে চাই,
“রাঙা বউ, রাঙা ভোর, রাঙা রাত পূর্ণিমা
নদী পাড় বাঁশঝাড়, হঠাৎ এক মাছরাঙা।

রঙ দিয়ে রঙ নিয়ে এঁকেছ যে ছবিটা
যেদিকেই চোখ যায় দেখতেই পাবে তা।

চুপচাপ দেখে নেয় সব গড়া সব ভাঙা
নদী পাড় বাঁশঝাড়, চুপচাপ মাছরাঙা।

ঘরদোর, এ নগর, এই পথ, এ সময়
এ শহর পুরোটাই, একটুও গ্রাম নয়।

এই দিন, এই রাত, এই সব ঠিকানা
নদী পাড় বাঁশঝাড়, দেখে নেয় মাছরাঙা।”

পরিবেশ বিপর্যয়

সালাহ্ উদ্দিন মিঠু

বৃক্ষরাজি যাচ্ছে কমে
নিত্য এখন বাড়ছে খরা,
গলছে বরফ মেরুর বুকে
সদায় বিবর্তিত হচ্ছে ধরা।

অক্সিজেন এর জোগান দাতা
ফল ফুল ছায়া বায়ু দূষণ,
রক্ষা করে ঝড় ও তুফান
দূষণ বায়ু করে শোষণ।

কলকারখানার বর্জ্য ধোঁয়া
পরিবেশের হচ্ছে ক্ষতি,
শিল্পায়নের ঠান্ডা লড়াই
ঠিক নাই কারো মতিগতি।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ছে পাহাড়
শহর বাড়ি দালান কোটা,
উত্তপ্ত এই ধরার বুকে
হণ্যে হয়ে সবার ছুটা।

কার্বন নিঃসরণের ফলে
জলবায়ুতে পরিবর্তন ,
বৃক্ষ মোদের পরম বন্ধু
অবাধে তা হচ্ছে কর্তন।

ENGLISH ARTICLES

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
খ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ আরিশা হোসাইন আঁকা চিত্র।

Our Land, Our Future: Combating Desertification and Building Drought Resilience in Bangladesh

Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed*, Mr. Md. Fozla Hossain**

Abstract

The theme for the 2024 International Environment Day, "Land restoration, desertification, and drought resilience," resonates deeply with Bangladesh, a country grappling with the intensifying challenges of drought. This article explores the global and national landscapes of drought. It examines Bangladesh's vulnerability to drought, highlighting the plight of the Barind and High Barind regions facing water scarcity. The article then delves into the country's climate change policies and strategies for drought adaptation and mitigation, particularly focusing on the National Adaptation Plan (NAP) of Bangladesh. Finally, it underscores the crucial role of collaborative efforts, including government initiatives, international support, and the work of NGOs with the leadership of PKSF, in building drought resilience.

The Intensifying Threat of Drought

Drought, a period of abnormally dry weather that significantly affects water availability, is a major threat to ecosystems, economies, and human security globally. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) projects an increase in drought frequency and intensity due to climate change, particularly in already vulnerable regions. Rising temperatures lead to increased evaporation, reducing soil moisture and surface water levels. Additionally, changes in precipitation patterns, with longer dry spells and intense rainfall events, further exacerbate drought conditions [1]. The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) reports that over 2 billion hectares of fertile land are degraded globally, impacting the livelihoods of 1.5 billion people.A total of 842 million people, or about one in eight people in the world, were estimated to be suffering from chronic hunger in 2011–2013 and 12 million hectares of productive land become barren every year due to desertification and drought alone, which is a lost opportunity to produce 20 million tons of grain (UNCCD, 2014)[2].

Drought in Bangladesh

Bangladesh, despite its abundant freshwater resources, faces a unique challenge with drought. The country experiences a distinct dry season (November-May) with minimal rainfall, leading to water scarcity, particularly in the northwestern and southwestern regions. In the last 60 years the region's average temperatures have increased and will continue rising, which is affecting agriculture, health and productivity. This could cost Bangladesh 6.7 percent of Gross Domestic Product and depress the living standards of more than three-quarters of the country's population by 2050. [3].

Reasons for Worsening Droughts in Bangladesh

Bangladesh, a land seemingly blessed with abundant rivers, faces a paradoxical challenge: drought. The country endures a distinct dry season (November-May) characterized by minimal rainfall, leading to water scarcity, particularly in the northwestern and southwestern regions. This vulnerability to drought intensifies due to several converging factors:

*Deputy Managing Director, PKSF

**Deputy Manager, PKSF.

- **Climate Change:** Rising temperatures, as mentioned earlier, are a major driver of drought. Studies by the World Bank [3] indicate a potential increase in average annual temperatures by 1.0-1.5°C by 2050 in Bangladesh, further exacerbating drought conditions.

- **Erratic Rainfall Patterns:** While Bangladesh receives a significant amount of annual rainfall, the distribution is highly uneven. The monsoon season (June-September) accounts for most of the rainfall, leaving the dry season with limited water resources. Furthermore, climate change is projected to disrupt these patterns, leading to longer dry spells and unpredictable rainfall events.

- **Groundwater Depletion:** Overexploitation of groundwater resources for irrigation and other purposes is a significant concern. A study by the International Water Management Institute (IWMI) found a rapid decline in groundwater levels in some parts of Bangladesh, particularly in the northwest region. This depletion further reduces water availability during dry seasons.

- **Land Degradation:** Deforestation and unsustainable land-use practices have led to soil erosion and reduced water retention capacity. Vegetation plays a crucial role in regulating the water cycle by promoting infiltration and reducing evaporation. Deforestation and desertification contribute to drier soil conditions and exacerbate drought effects.

- **Transboundary Water Management:** Dams and barrages constructed upstream by neighboring countries on shared rivers can significantly reduce water flow into Bangladesh, particularly during dry seasons, further aggravating drought conditions.

- **Evapotranspiration:** The combined process of evaporation (water turning into vapor) and transpiration (plants releasing water vapor) is a natural phenomenon. However, rising temperatures can lead to increased evapotranspiration rates, further depleting water resources and intensifying drought impact.

- **Rice-Based Cropping Pattern:** Rice, a staple crop in Bangladesh, is water-intensive. While it provides food security, the extensive cultivation of rice contributes to high water consumption, particularly during the dry season. This traditional cropping pattern might need to be re-evaluated in the context of water scarcity.

The Consequences of Drought in Bangladesh

- **Ecology and Biodiversity:** Drought disrupts delicate ecological balances, impacting plant and animal life. Reduced water availability can lead to habitat loss, hinder breeding cycles, and threaten the survival of entire species.

- **Soil Moisture Pattern and Texture:** When drought strikes, it alters the natural soil moisture pattern. With less water infiltrating the ground, vital nutrients leach away, and soil texture can become coarser, further reducing water retention capacity. This degradation creates a vicious cycle, making the land increasingly vulnerable to future droughts.

- **Agricultural Losses:** Drought significantly impacts agricultural productivity, particularly in rain-fed agriculture. Crops suffer from moisture stress, leading to stunted growth, reduced yields, and crop failures. This not only affects food security but also disrupts livelihoods for millions of farmers who depend on agriculture for their income.

- **Fisheries:** Drought can have a devastating impact on freshwater fisheries. Reduced water levels in rivers, ponds, and beels (seasonal wetlands) disrupt fish breeding grounds and reduce overall fish stocks. This not only affects food security but also jeopardizes the livelihoods of fishermen and those involved in the aquaculture industry.

- **Livestock**: Livestock, especially poultry, are highly vulnerable to drought. Water scarcity affects their health and productivity. Heat stress, a consequence of drought, can further reduce poultry production.

- **Loss of Employment:** While drought may lead to some changes in cropping patterns, like an increase in mango production in the Barind area, this shift can be a double-edged sword. While mango trees require less water, they are also less labor-intensive compared to traditional crops. This shift can lead to a loss of employment for agricultural workers who rely on daily wages during planting and harvesting seasons. Additionally, the intense heatwaves associated with drought can reduce working hours for daily laborers in various sectors, further impacting their income.

- **Water Availability:** Drought reduces surface water availability in rivers, streams, and ponds. This scarcity affects drinking water supplies for both humans and livestock. Additionally, it reduces water availability for domestic use and sanitation, impacting public health.

Policy support on Drought

Bangladesh acknowledges its vulnerability to climate change, including drought, in its National Adaptation Programme of Action (NAPA) [7] and Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) [8]. These documents outline strategies for drought adaptation, including rainwater harvesting, improved water management practices, promoting drought-resistant crop varieties, and developing drought early warning systems.Recognizing its vulnerability to climate change, including drought, Bangladesh has developed a comprehensive National Adaptation Plan (NAP) [10]. The NAP outlines strategies and actions to enhance the country's resilience to climate change impacts.

Building a Drought-Resilient Bangladesh

- **Technological Interventions:** Investing in drought-tolerant crop varieties, efficient irrigation technologies like drip irrigation, and climate-smart agriculture practices like conservation agriculture can significantly improve adaptation. Research and development institutions, along with international collaboration, can play a key role in developing and disseminating these technologies.

- **Introducing Crop Diversification and tolerant varieties:** Promoting the cultivation of a wider variety of crops, including drought-tolerant legumes, pulses, and vegetables, can help mitigate the risks associated with relying on a single water-intensive crop like rice.

- **Improved Water Governance:** Strengthening water governance frameworks is essential to ensure equitable and sustainable water use practices. This includes developing and enforcing water regulations, promoting water pricing mechanisms that incentivize conservation, and fostering public awareness about the importance of water conservation.

- **Financial Resources:** Mobilizing financial resources from government budgets, international donors, and private investments is critical for implementing drought resilience projects across various sectors. Innovative financing mechanisms such as climate bonds and green funds can contribute significantly.

- **Community-Level Initiatives:** Empowering local communities through capacity building and promoting traditional water conservation methods like rainwater harvesting and small-scale irrigation systems are crucial. NGOs with the leadership of PKSF can play a vital role in facilitating these initiatives by providing technical assistance and financial resources.

The Role of PKSF in Building Drought Resilience:

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), a leading national development organization in Bangladesh, plays a crucial role in addressing drought through its Environment and Climate Change Unit (ECCU). PKSF's vast network of partner NGOs allows for effective implementation of drought resilience projects at the grassroots level. Here's how PKSF contributes:

- **Financial Support:** PKSF provides financial support to NGOs for implementing drought resilience projects. These projects can involve rainwater harvesting structures, micro-irrigation systems using surface water, Managed Aquifer Recharge (MAR), promoting drought-resistant crops, and establishing drought early warning systems.

- **Technology Transfer:** PKSF, in collaboration with research institutions and private sector partners, can play a vital role in transferring drought-resilient technologies to the community level. This could involve promoting the use of efficient irrigation equipment, introducing low-cost sensors for soil moisture monitoring, or disseminating knowledge on climate-smart agricultural practices like conservation tillage.

- **Knowledge Sharing:** PKSF facilitates knowledge sharing and best practices among NGOs and communities working on drought resilience. This promotes learning and innovation in drought adaptation strategies.

- **Capacity Building:** PKSF provides capacity building programs for communities on drought preparedness, water conservation practices, and climate-smart agriculture techniques. This empowers communities to manage their resources effectively and adapt to drought conditions.

Case Study: GCF-Funded ECCCP-Drought Project:

The Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) tackles the challenges of drought in Bangladesh through a multi-pronged approach, such as: Promoting Sustainable Agriculture by introducing drought-tolerant cropping patterns featuring crops like rice,

wheat, and mung bean that require less water, Promote the cultivation of drought-resistant fruit trees and cash crops like cotton, Facilitate linkages between farmers and agricultural extension services for seed access and technical support.

Enhancing Water Availability, through renovate and expand canals and ponds to improve surface water storage capacity, Implement Managed Aquifer Recharge (MAR) systems, including rooftop rainwater harvesting, to replenish groundwater reserves and

Strengthening Capacity and Raising Awareness by establishing climate change units and train government institutions and NGOs on water management and climate adaptation strategies and by Organize workshops and training programs for communities to raise awareness about climate change and equip them with knowledge and skills to respond effectively to droughts.

References

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/

[2] United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). (n.d.). Land Degradation. https://www.unccd.int/

[3] World Bank. (2018).Bangladesh: Rising Temperature Affects Living Standards of 134 Million Peoplehttps://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/26/bangladesh-rising-temperature-affects-living-standards-of-134-million-people

[4] Shahid, S., &Behrawan, H. (2008). Drought risk assessment in the western catchments of Bangladesh. International Journal of Climatology, 28(7), 899-911. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-007-9191-5

[5] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_69_283.pdf

[6] The Paris Agreement. (2015). https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

[7] Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2005). National Adaptation Programme of Action (NAPA) to Climate Change. https://moef.gov.bd/

[8] Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2009). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP). https://moef.gov.bd/

[9] International Organization for Migration (IOM). (2017). The Climate Change and Migration Nexus. https://www.iom.int/

[10] Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2018). National Adaptation Plan (NAP) of Bangladesh: Summary for Policymakers. https://moef.gov.bd/

[11] https://www.greenclimate.fund/project/sap026

Towards Food Security through Sustainable Agriculture

Dr. Md. Sohrab Ali*

With the progress of civilization, man has learned many skills, but only rarely has he learned to preserve his source of food. Civilized man has despoiled most of the lands on which he has lived for long. It has been a chief cause for the decline of his civilizations in older settled regions (Dale and Carter, 1955). Across the globe, up to two billion people currently live under severe food insecurity and do not have regular access to safe, nutritious, and sufficient food. The latest science from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) lays bare the widespread degradation of formerly productive land. The world is not on track to achieve the UN's second Sustainable Development Goal of Zero Hunger by 2030. If recent trends continue, some 10 percent of the global population will be hungry in 2030 (UN Convention to Combat Desertification – UNCCD).

Land is being degraded rapidly worldwide. Land degradation is the result largely of anthropogenic causes which exploit land, causing its utility, biodiversity, soil fertility, and overall health to decline. Land degradation changes and disrupts rainfall patterns, exacerbates extreme weather like droughts or floods, and drives further climate change. 32 gigatons of Carbon will be lost from the land due to intensive agriculture between 2015-2030. 70% of all ice-free land has already been altered by human activity impacting over 3.2 billion people (UNCCD). Ensuring food security for a growing global population requires healthy land resources and flourishing ecosystems. Yet current agricultural practices are causing soils worldwide to be eroded up to 100 times faster than natural processes replenish them. At current rates, 90 percent of land will bear our imprint by 2050. The impacts of land degradation will be felt by most of the world's population. It results in social and political instability, which drives poverty, conflict, and migration.

To arrest, and then reverse, this alarming picture of the future the UN General Assembly (UNGA) and the UNCCD simultaneously adopted the goal of land degradation neutrality (LDN) by 2030 with the objectives of – (1) maintaining or improving the sustainable delivery of ecosystem services, (2) maintaining or improving land productivity to enhance global food security. (3) increasing the resilience of land and the populations dependent on it, (4) seeking synergies with other social, economic, and environmental objectives, (5) reinforcing and promoting responsible and inclusive land governance. LDN is defined as "a state whereby the amount and quality of land resources necessary to support ecosystem functions and services to enhance food security remain stable, or increase, within specified temporal and spatial scales and ecosystems." Globally 196 countries including Bangladesh have pledged (or are aiming) to achieve LDN by 2030. Achieving LDN requires three concurrent actions: (1) avoiding new degradation of land by maintaining existing healthy land; (2) reducing existing degradation by adopting sustainable land management practices that can slow degradation while increasing biodiversity, soil health, and food production; and (3) ramping up efforts to restore and return degraded lands to a natural or more productive state.

Bangladesh perspective

Land use change is faster than any other time in the history while country is losing arable land @ 1% per annum for other non-agricultural uses. Per capita land is on the decrease due to ever

* Director (Planning), Department of Environment

increasing population (leading to growing demand for land for food production). Hence the toughest challenge for Bangladesh is to attain food sufficiency for a growing population from a diminishing land resources (per capita Net Cropped Area was 0.044ha during 2000 - 2001). The current agricultural system largely depends on inorganic inputs (fertilizers, pesticides, etc.). Over exploitation of land, over use/ inappropriate use of chemical inputs, etc. lead to environmental and land degradation/pollution. Over exploitation of land leads to nutrients mining and this could be handled by integrated nutrient management, cultivation of low nutrient demanding crops, etc. Over use/ misuse may lead to leaching loss of nutrients to the sub-soil layer and that could be reused by cultivating shallow rooted crops in the same land followed by deep rooted crops. A study jointly organized by the Department of Environment (DoE) and Soil Resource Development Institute (SRDI) identified 12 types of land degradation (soil nutrient depletion, organic matter depletion, acidification, salinization, soil pollution, soil erosion, riverbank erosion, sandy over wash, drought, waterlogging, soil sealing and ecosystem degradation) accounting land degradation 76.2% in the country. Annual average degradation is @ 27,000ha during 2000 to 2020 (Zahid et al., 2020).

Bangladesh is committed to achieve "Land Degradation Neutrality (LDN)" by 2030. Towards this end the government has adopted "Road map for Combating Land Degradation in Bangladesh". As part of this road map, under the supervision of DoE, the Department of Agriculture Extension (DAE) and the Barind Multi-purpose Development Authority (BMDA) identified and documented a good number Sustainable Land Management (SLM) technologies of some selected areas of Bangladesh. However, documentation of SLM technologies in other areas of the country as well as scaling up and scaling out of documented technologies are essential to sustain agriculture by meeting climate change.

Climate change is now reality and Bangladesh is the innocent victim of it. The number of dry days per annum is on the increase and thus, longer dry period critically affects horizontal and vertical agriculture. Land degradation and drought have slow moving but far reaching negative impacts on the production system. To be optimally and sustainably productive, an ecosystem needs stability and resilience maintaining a delicate balance between the land-soil-water-climate milieu and the living plants, animals and humans. Fragility sets in when this delicate balance is disturbed due to internal processes within the ecosystem or external forces and influences or both working simultaneously or in succession (Bokhtiar et al. 2023). To cope with this changing environment, Bangladesh needs to redesign its cropping patterns by considering following aspects:

1. Shallow rooted crops followed by deep rooted crops.
2. Low nutrient demanding crops.
3. Low water demanding crops and avoid/reduce high water demanding crops. This is how a larger area may be brought under irrigation with a certain amount of water. Avoid ground water irrigation because this is simply a misuse of high quality drinking water. Long term ground water irrigation may cause soil salinity.
4. Mainstreaming SLM best practices and crop sanitation.
5. Follow ecosystem based approaches to adaptation (EbA).
6. Follow Crop Zoning.
7. Judicious application of fertilizers and pesticides.
8. Climate resilient stress tolerant crop varieties.

References

1. Bokhtiar , S. M., Samsuzzaman, S., Jahiruddin, M and Panaullah, G. M. 2023. Agricultural Development for Fragile Ecosystems in Bangladesh. Published by Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka, Bangladesh, p. 369
2. Dale, Tom and Carter, Vernon Gill 1955. TOPSOIL AND CIVILIZATION. University of Oklahoma Press.
3. Sustainable Land Management Best Practices of Selected Areas of Bangladesh. Published by the Department of Environment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, May 2022.
4. www.unccd.int
5. Zahid A M, Kohinoor N A, Hossain M A, Ali M S & Shoaib J U 2022. Land Degradation in Bangladesh 2020. DoE coordinated and UNEP & GEF supported research report, SRDI, Dhaka.

Optimising Opportunities for Nature-based Solutions

Dr. Md. Saifur Rahman*

Nature-based Solutions: A Sustainable Policy Intervention

Bangladesh, a rising economy, is confronted with a multitude of development-related challenges, exacerbated by the existential threats of climate change, biodiversity loss, and environmental degradation. These challenges pose a significant barrier to the country's Sustainable Development Goals. Nature-based Solutions (NbS) offers a sustainable policy intervention that not only addresses these challenges but also enhances social and economic security, empowering local communities. The urgency of implementing NbS is underscored by the successful mangrove afforestation in coastal regions, which has significantly reduced cyclone impacts. This compelling success story highlights the immediate need for NbS, urging us to act swiftly for a sustainable future.

The 8th Five-Year Plan of Bangladesh states that Bangladesh is amongst the fastest growing countries in the world and will be graduated from the Least Developed Country Status by 2026. The country strives to achieve sustainable development goals and other national and international targets and priorities. In this regard, the country's vision is to develop a prosperous delta, for which maintaining balanced growth, ensuring equity, environmental protection, and sustainable natural resource management remains challenging. At this juncture, innovative interventions which can co-produce and co-create multiple benefits concurrently must be chosen for implementation and scaling up for the welfare of society. According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), NbS is considered a transformative approach, harnessing the potential of nature that can sustainably manage natural ecosystems, address societal challenges and simultaneously provide human well-being and biodiversity benefits. Scientists call for protecting natural ecosystems and biodiversity, which is the key to solving vital climate-induced socioecological problems. At the same time, nature provides essential goods and services for our survival.

However, evidence suggests that the lack of certain misconceptions, inadequate policy and political commitment, societal challenges and associated implementation gaps hinder to realise the ample opportunity linked to environmental, social, and economic benefits of NbS (see Gain et al., 2022; Smith et al., 2021; Kabisch et al., 2016). Therefore, the study attempts to bring those phenomena to the fore and conduct a critical analysis to understand the knowledge- gap regarding the barriers or challenges to scaling up or optimising the implementation and governance of NbS in Bangladesh.

Barriers and Challenges of Governing Nature-based Solutions

Primary data were collected purposively through a semi-structured questionnaire interviewing 212 policy actors and practitioners across scales and disciplines. Scholarly articles were searched and examined as secondary data to support the analysis and facilitate argumentative discussion. The result shows that the top 26% of the respondents considered lack of awareness as one of the main barriers to implementing NbS (Fig. 1). 22% of the respondents equally consider the knowledge gap and lack of policy provisions as challenges for implementing NbS. Then, insecure finance

* Deputy Secretary (Forest Biodiversity Section), Ministry of Environment, Forest and Climate Change

(16%), technological constraints (12%), and governance challenges (2%) are considered barriers to implementing NbS (Fig. 1).

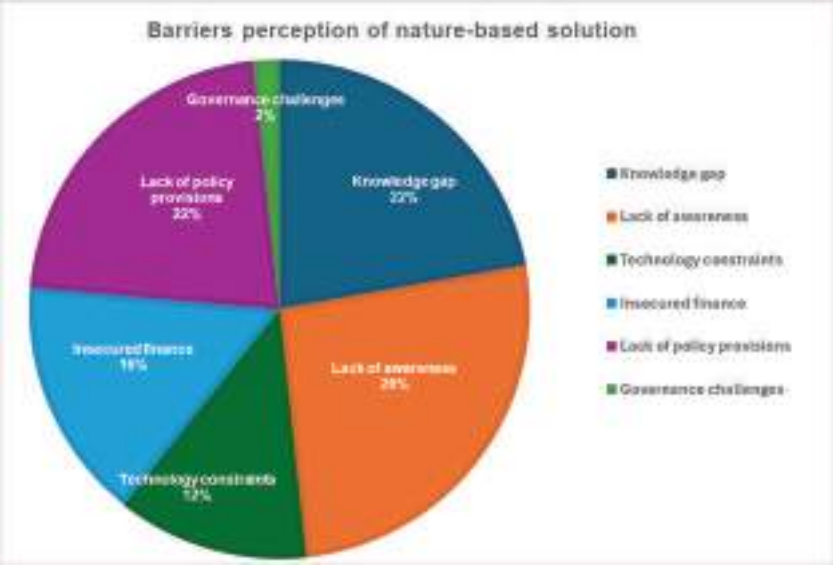

Figure 1: Discourse on barriers or challenges to scaling up the implementation and governance of Nature-based Solutions

Scholars agree that there are barriers and challenges observed to implementing and upscaling the practices of NbS; for example, Toxopeus and Polzin (2021) and Raymond et al. (2017) talked about accessing public and private finance for upscaling urban NbS; Kabisch et al. (2016) and Krauze and Wagner (2019) speaks about the lack of comprehensive information and dearth of evidence considered as critical barriers for the creation, implementation and managing the NbS. Path dependency is considered a barrier where decision-makers act as a resistance to change and love to depend on the action based on their known past experiences (Davies & Lafortezza, 2019). Institutional fragmentation ('Sectoral Silos') is another important barrier where different sectors usually work in line with their own vision, which oftentimes creates confusion about who is doing what (Frantzeskaki et al., 2017) and limits the opportunities for incorporating novelty in NbS planning and management (Ershad Sarabi et al., 2019; Wamsler, 2015).

Inadequate regulations and guidelines are among the barriers found in the literature (Chen et al., 2019), and policy actors are confused about the goals and returns of the NbS. One of the important barriers mentioned in the literature is the uncertainty regarding the implementation process and the effectiveness of the solutions (Albert et al., 2019; Nesshöver et al., 2017). In this regard, one of the experts interviewed defines the overall context as intriguing as below:

Yet, NbS is not adequately addressed in the respective policies and plans. Governance and regulatory mechanisms are not established. The lack of Technology and the complexity of its implications as nature-based solutions demand more integration among sectors by linking together policy, financial instruments, and technical advances. The stakeholders ' awareness and sensitisation regarding NbS are still poor. Recognition of the value of NbS has not yet been well established.

Optimising Opportunities in Scaling up Nature-based Solutions

Whatever people understand, they are convinced and wise enough to assume that NbS provides multiple benefits and opportunities once it is properly implemented. The solution pathway against identified challenges must be one step forward: getting out of siloed engineering, incorporating nature into our understanding, and undertaking bio-action grounded on science-policy hard talks. The sustainable solution should be the one that talks about nature-based solutions. With this view, the study puts some recommendations based on the study findings to overcome the challenges and optimise opportunities for scaling up the implementation of NbS below:

First, provisions for nature-based solutions should be adequately prescribed and addressed in the respective policies and plans for the environment, forest, climate change, water, agriculture, fisheries, and other relevant fields. A country-driven implementation strategy and guidelines might be developed. The complexity of its implications as nature-based solutions demand more integration among sectors by linking policy, financial instruments, and technical advances.

Second, ignorance of the concepts regarding nature-based solutions should be mitigated. In this regard, misinterpretation and oversimplification of NbS must be avoided. We need solid information and concrete data to demonstrate the co-benefits and efficiency of NbS. Knowledge regarding implementation tools, bio-engineering, effectiveness, and monitoring and evaluation frameworks should be conceptualised and recognised in the policy field.

Third, a long-term NbS-Country Investment Plan (NCIP) detailing financing needs and investment strategy under the leadership of the Finance Division in association with the relevant ministries and agencies might be developed. The Plan should document finance and investment opportunities from all public, private, bilateral, multilateral and other international sources. Bangladesh endorsed global designated and accredited bodies like the Global Environment Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund, and proposed Loss and Damage Fund, which should be targeted for secure funding for implementing the proposed plan. Moreover, as an intermediary measure, provisions might be made to mobilise NbS funding from the Bangladesh Climate Change Trust Fund. Moreover, a national guideline or certification scheme might be developed to assess the projects/schemes for NbS funding.

Fourth, advanced technologies and improved capacity enable Pandora's box to open and turn the complexities into a solution. Emphasis should be given to generating specialised knowledge and capacity in climate change adaptation and mitigation, biodiversity and nature conservation, access to finance, water resources management, nature-based agriculture, land use planning, environmental conservation, socio-economic aspects of NbS etc. Participatory planning, collaborative decision-making and systemic innovation would ensure the scalability and sustainability of NbS governance.

Finally, awareness and sensitisation initiatives can play a pivotal role in the success of NbS, as they drive educating concerned stakeholders (i.e., policymakers, private sector, and general people), which is essential for understanding the value of NbS and gaining support for its implementation. Awareness programs can encourage community involvement with local needs and knowledge, enhance funding and mobilisation of resources, support policy coordination between sectors, and promote co-design with socially accepted solutions, which can support sustainability and large-scale implementation of NbS.

PCB A Forgotten Legacy

Md. Hasan Hasibur Rahman*

PCBs or polychlorinated biphenyls, represent a category of chemicals designated as one of the original twelve Persistent Organic Pollutants (POPs) addressed by the Stockholm Convention. They exhibit characteristics such as durability, heat retention, and the ability to form an oily liquid at typical room temperatures, making them valuable in electrical and various industrial purpose. However, despite their utility, PCBs are hazardous substances, posing significant risks to both the environment and human health due to their toxic nature and synthetic origin.

In 1865, the initial "PCB-like" compound was identified as a byproduct of coal tar. Afterward, in 1876, German chemist Oscar Döbner (Doebner) synthesized the first PCB within a laboratory. PCBs constitute a class of persistent organic pollutants (POPs) that were manufactured extensively from the 1930s through the 1980s. Following this development, significant quantities of PCBs were discharged into the environment.

They were used in closed applications, such as electric transformers and capacitors and in open applications such as paint, buildings, installations and machinery where they are more easily released into the environment and therefore pose a significant risk to direct human exposure in daily life. PCBs are also formed and released unintentionally from several anthropogenic sources such as, waste incinerators, cement kilns, metallurgical industry, residential combustion, among others. Although no longer allowed to be produced, PCB can still be found everywhere. It is a global issue, everyone in the world is likely to have PCB quantities in their body.

PCBs persist in the environment for long periods and can travel over great distances through air, water and migratory species across international boundaries. They accumulate in fatty tissues and bio-magnify higher up in

Persistent organic pollutants (POPs)

POPs are hazardous chemicals that threaten human health and the planet's ecosystems. POPs remain intact for a long time, widely distributed throughout the environment, accumulate and magnify in living organisms through the food chain, and are toxic to both humans and wildlife.

POPs travel long distances, they are found in the environment around the globe, including close to industrial and urban settings, but also in remote locations such as the Arctic, high mountains and Pacific Ocean trenches at 7-10,000 meters below sea level.

Humans are exposed to POPs in a variety of ways, mainly through the food we eat, the air we breathe, in the outdoors, indoors and at the workplaces. Many products we use in our daily lives used to contain and/or may still contain POPs, which have been added to improve product characteristics, such as flame retardant or waterproofing.

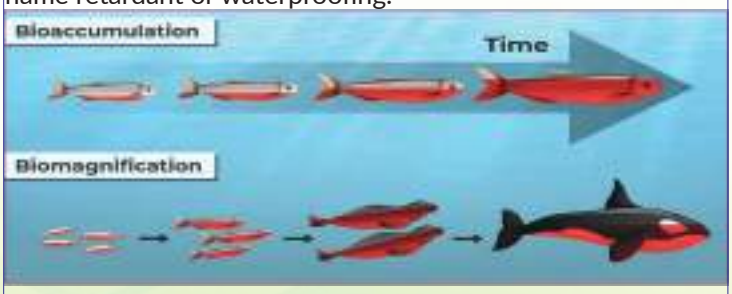

Figure 01: Bio-magnify of PCBs in the food chain

* Deputy Director, Department of Environment.

the food chain, where they can be harmful to top predators such as tuna, seals, polar bears and humans. From the 209 different types of PCBs, 13 are considered to be dioxin-like POPs. Their persistence in the environment corresponds to the degree of chlorination, and half-lives can vary from 10 days to one-and-a-half years.

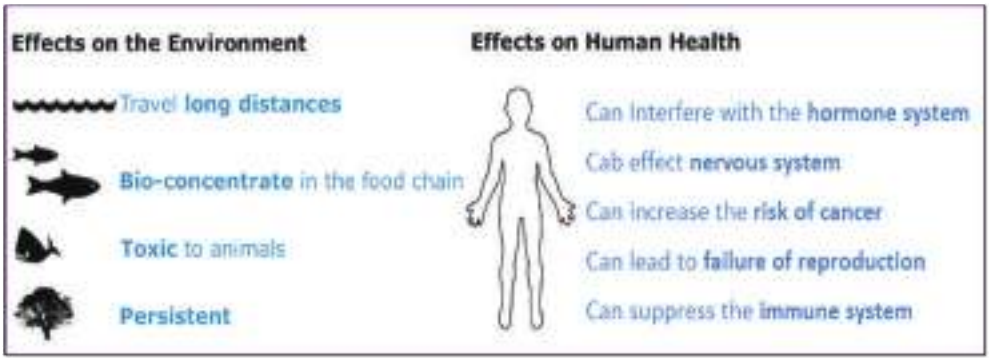

Figure 02: Effects of PCBs on the Environment and Human Health

It is estimated that between 1 and 1.5 million tonnes of PCBs have been produced worldwide by a small number of countries (12) since the late 1920s.

Country	Start of production		End of production		Amount (1,000 t)	
	Earliest estimate	Latest estimate	Earliest estimate	Latest estimate	Lowest estimate	Highest estimate
Korea (DPR)	1960s	1960s	2006	>2006	25	30
Soviet Union/ Russian Federation	1938	1939	1993	1993	180	180
Spain	1930	1955	1984	1986	25	29
Czechoslovakia	1959	1959	1984	1984	21	21
West Germany	1930	1950	1983	1983	59	300
Italy	1958	1958	1983	1983	24	31
France	1930	1930	1980	1984	102	135
Poland	1966	1966	1977	1977	2	2
USA	1929	1930	1975	1977	476	700
China	1960	1965	1974	1983	7	10
Japan	1952	1954	1972	1972	59	59
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	1951	1954	1965	1977	66	67
Total					**1,046**	**1,512**

Table 01: Estimates of global PCB production (tons) as “pure” chemical (UNEP-POPS-COP.8-INF-10)

It is important to note that due to dilution and cross-contamination, the mass of liquids and equipment containing or contaminated with PCB is much larger than the amounts of pure PCB produced: a single tonne of PCB can generate multiple tonnes of PCB wastes.

The progress in eliminating PCB varies considerably across UN regions. In January 2016 UNEP estimated that only 17% of total of equipment and materials containing PCB (transformers account for the largest share of the total mass) have been eliminated, at the rate of about 200,000 tonne/ year since 2000. 83% of the total are still to be eliminated.

Addressing the remaining 83% would require the elimination of 1 million tonnes of PCB-containing oils and contaminated equipment per year to reach the 2028 target. Only 30% of the countries are on track to reach the 2025 and 2028 goals.

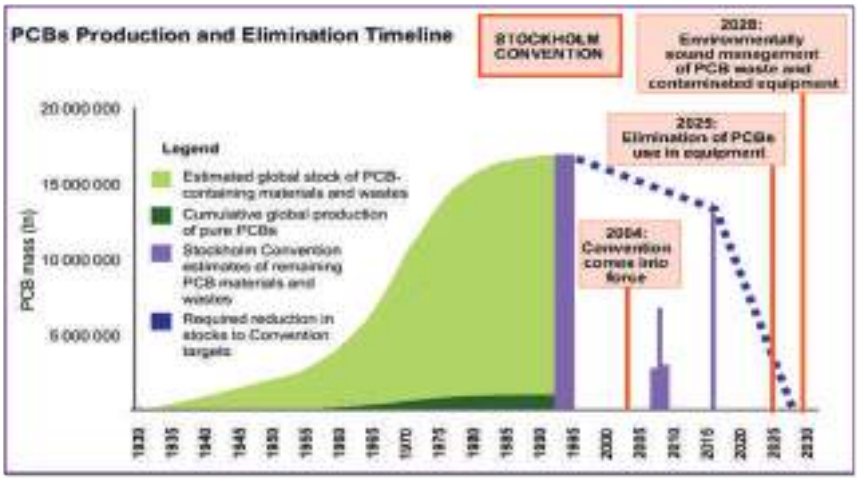

Figure 03: PCBs Production and Elimination Timeline

Bangladesh took significant steps to combat Persistent Organic Pollutants (POPs) by becoming a signatory to the Stockholm Convention on May 23, 2001, and later ratifying the Convention on March 12, 2007. The Convention officially came into force in Bangladesh in June 2007. Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change is the focal point of this convention.

To eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants (POPs) an international environmental treaty `Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants' is signed on 22 May 2001 in Stockholm and effective from 17 May 2004, the Stockholm Convention

In compliance with its commitments under Article 7 of the Stockholm Convention, Bangladesh formulated a National Implementation Plan (NIP) for POPs in January 2007. This NIP outlines a total of nine projects aimed at implementing the provisions of the Stockholm Convention, one of which is focused on the management and phased-out of PCBs.

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), often referred to as the Stockholm Convention, is a global treaty established to address and regulate the production, use, and release of certain persistent organic pollutants (POPs). To date, 186 countries have ratified the Convention.

Its primary objectives are to protect human health and the environment from the harmful effects of POPs and to promote the elimination or restriction of their production, use, and release. The treaty lists specific chemicals, including pesticides, industrial chemicals, and by-products, as POPs. Notable examples of POPs include polychlorinated biphenyls (PCBs), dichloro diphenyl trichloroethane (DDT), dioxins etc.

Under the Stockholm Convention, parties commit to eliminate the use of PCB in equipment by 2025 and make determined efforts to lead to the environmentally sound management of waste liquids and equipment contaminated with PCB by 2028. The production of PCB and new uses are prohibited, and equipment containing PCB shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management. PCBs have been listed on Annex A of the convention as part of the 12 initial POPs, as industrial chemicals and unintentional by-products.

The parties under the Stockholm Convention are no longer allowed to manufacture PCBs and must discontinue their use of this chemical. However, existing equipment containing or contaminated with PCBs can be used until 2025.

In order to achieve the goal of the Stockholm Convention by 2025, Department of Environment has been implementing "Environmentally Sound Development of the Power Sectors with the Final Disposal of Poly Chlorinated Biphenyls (PCBs)" project with financial support from the Global Environmental Facility (GEF) and technical assistance from United Nation Industrial Organization (UNIDO).

Associate implementation agencies of this project are

- Bangladesh Power Development Board (BPDB);
- Power Grid Company of Bangladesh (PGCB) Limited
- Bangladesh Rural Electrification Board (BREB);
- Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC);
- Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO);
- West Zone Power Distribution Company (WZPDCO) and
- Northern Electricity Supply Company Limited (NESCO).

The overall objective of this project is to protect the human health and the environment from the adverse effect of PCB by reducing and/or eliminating the releases and exposure to PCBs through establishment of an Environmentally Sound PCB Management System.

The specific objective of the project is

- To assist the power sector of the country in fulfilling its PCB-related obligations under the Stockholm Convention by enhancing national capacities for safe PCB management throughout entire life-cycle (inventory, usage, handling, storage, transportation and disposal).
- To assist the stakeholders for final disposal of more/less 500 tons of PCBs contained equipment.

Our overarching objective is to fulfill the targets of the Stockholm Convention, which entails eliminating the utilization of polychlorinated biphenyls (PCBs) in equipment by 2025 and establishing an environmentally responsible approach to handling liquid and equipment waste contaminated with PCBs by 2028. The attainment of this goal is of paramount importance, as it will not only safeguard the well-being of both humans and the environment but also mitigate the adverse repercussions associated with PCBs, which are hazardous compounds

Can Community-based tourism facilitate to conserve the Sundarbans?

Md. Mozahidur Rahman*

Community-based tourism is regarded as a tool for natural and cultural resource conservation and community development and it is closely associated with ecotourism, sometimes referred to as community-based ecotourism. It provides alternative economic opportunities which are in essence in rural areas. It has been implemented in many developing countries, often in support of wildlife management, environmental protection and/or development for indigenous people (Harris and Vogel, Undated). Unlike mass tourism often resulting disruption of local economies, seasonal unemployment, degradation of natural and cultural environment, community-based tourism is supposed to be more cautious and environment- friendly with sustainable tourism approach (Gorcia and Paloca, 2006).

The Sundarbans mangrove forest, one of the largest such forests in the world, is formed at the delta of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers on the Bay of Bengal (Viju,1995 cited in Salam et al., 2000). Sundarbans Reserved Forest (SRF) of Bangladesh is the single largest tract of mangrove forest in the world covering an area of about 6,017 km2. This consists about 51% of the total forest area and 4.2% of the total land area of the country (Haider, 2004). The site is composed of three sanctuaries (Sundarbans West, South, and East) with a total area of 140,000 hectares. The three sanctuaries, intersected by a complex network of tidal waterways, mud flats and small islands of salt tolerant mangrove forests, present an excellent example of ongoing ecological processes, displaying the effects of monsoon rains, delta formation, tidal influence and plant colonisation. The area is known for its wide range of fauna including birds, reptiles, the Royal Bengal tiger and other threatened species, such as the estuarine crocodile and the Indian python. The Sundarbans is not only the world's largest continuous mangrove forest but is also of great economic importance to Bangladesh, as a prime source of valuable natural products ranging from building timber to prawns and honey to palm leaves for thatching. Sundarbans is an excellent potential tourism spot in Bangladesh as well as in the world. All the year round, a considerable number of domestic and international visitors/tourists visit this mangrove forest (Blower, 1985 cited in Salam et al., 2000).

It is a matter of fact that the Sundarbans is experiencing illicit felling and overexploitation (Iftekhar and Islam, 2004). Due to the degradation there are different problems in environmental services e.g., protection against cyclones, tidal surges, land erosion, salinization, etc. and the forests also decline itself. As a result, people's vulnerability is increasing due to the detrimental effect of these factors.

There are no permanent residents inside the Sundarbans although some 300,000-600,000 people earn their livelihood collecting honey, palm leaves, cutting grass, cutting wood, and catching and drying fish (FAO/UNDP, 1994 cited in Salam et al., 2000). While the Sundarbans is one of Bangladesh's major tourist attractions due to its natural resources and wildlife, poachers and illegal hunters along with the local people threaten this world heritage. Deforestation has taken place with active involvement of local people to meet their daily necessaries. But these local people surrounding the villages of the Sundarbans may play a strong and vital role to conserve the natural resources of SRF.

* Deputy Director, Department of Environment.

In fact, Due to lack of income opportunities, education and environmental consciousness most of the people living adjacent to Sundarbans are fully or to some extent dependent on the natural resource harvestation of the Sundarbans which threatens the forest as a whole. This scenario urges enormous alternative income generation for the locals which can alter the pattern of dependency on the natural resources of the Sundarbans. This modified dependency on the Sundarbans will contribute to reduce extraction of natural resources of the forest and restrict the outsider illicit fellers by their non-cooperation attitude to smash up the forest). The landscapes, flora, fauna and traditional culture of a protected areas form attractions for the tourists (Ceballos-Lascurain, 1993). Tourism is highly dependent upon natural capital (e.g. wildlife, scenery, etc.) and associated culture (Roe and Khanya, 2001). One of the most common uses of protected areas is tourism and also the surrounding area, the people; their culture, practice, etc. are (potential) attractions for the tourists. It has been broadly accepted, the local stewardship of resources plays an important role in the long-term sustainability of resource use. A range of collaborative activities has demonstrated that the participation of local communities in the management of forest resources greatly assists in conservation as well as promotes rural development. CBT is one such emerging activity that is generating much interest among local people, tour operators, government agencies, and business sector. CBT could be an option of generating a more sustainable tourism industry.

It is difficult to protect the flora and fauna unless there are economic benefits to the country as well as to the local people. Nature oriented tourism can be one means to help achieve sustainability in the reserve forest as well as protecting the important world heritage site. Well-planned tourism could provide economic and political incentives for proper management and for conservation and could bring additional benefit to local communities and regional economies (Salam et al., 2000).

In these regards, CBT has great potentialities to develop at the surrounding villages of the Sundarbans particularly at the entry points of the forest. The surrounding village Dhangmari of Chandpai Range and Burigoalini of Satkhira Range of the Sundarbans have such potentialities to develop CBT to emancipate the local people and improve their socio-economic status by generating alternative source of income for their (local peoples') livelihood. A variety of activities of CBT such as local eco-guide, selling handicrafts, tour operators, porters, etc. seek positively to make link conservation with economic development.

Local people can derive maximum benefits and contribute to conserving the local resources (cultural and/or environmental) on which tourism is dependent (RECOFTC, 2007). Unemployed people in the neighborhood of Sundarbans can be employed in the service industries, operating or accompanying jungle boat trips and wilderness trails and assisting in transport operation. In addition, small handicrafts industries, including basket work, weaving, leather goods, brass ware, jute products and clay pots can be established in nearby villages. When these people are benefited economically from eco-tourism, they may support habitat-protection in the Sundarbans. The visitors and tourists will come to these villages and stay with local people, enjoy the local people culture, appreciate their various activities, buy their handicrafts, visit the surrounding attractions with the cooperation of the local people (act as guide or demonstrator) and thus they can earn in a different way other than to harvest the natural resources of the Sundarbans. At the same time these locals will be engaged with the tourists while they visit the Sundarbans for one or more

days by providing supports of eco-guides, transports, daily necessities, etc. The whole process of facilitating the conservation of SRF through CBT activities can be depicted in the following diagram.

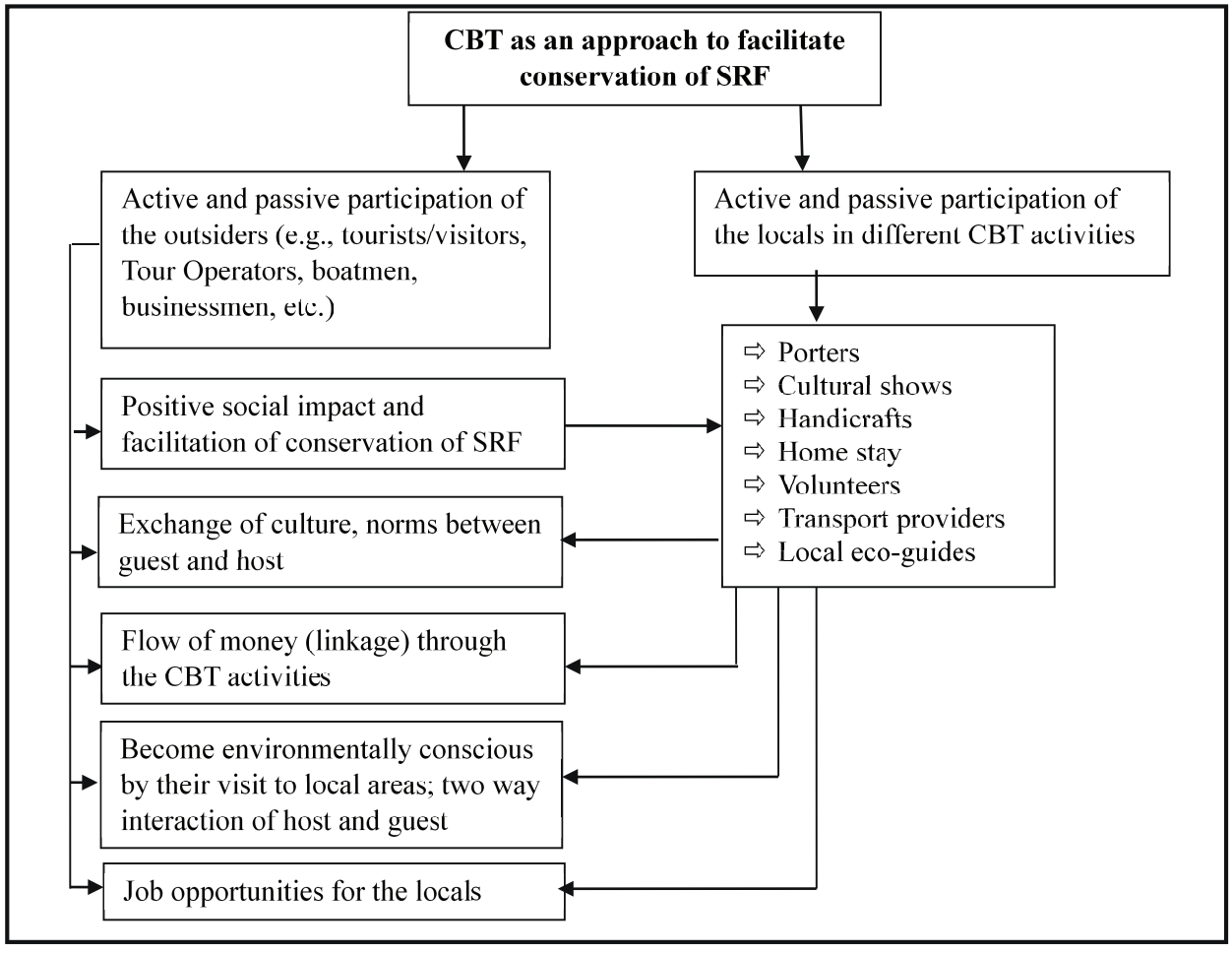

Figure: The process of facilitation to conserve SRF through CBT as an approach.

CBT is a new concept in Bangladesh which has to disseminate among different stakeholders (local people, Tour Operators, Forest Department, NGOs, etc.) of the country. If a proper plan can be taken to initiate the concept of CBT at the surrounding villages of the Sundarbans then it will reduce the pressure on the forest to make a more resourceful healthier forest and also a unique tourism (more specially ecotourism) spot. Eventually it will contribute to improve the environment i.e. the very fragile mangrove ecosystem. Thus, Government may earn more revenue from the forest sector as well as tourism at the both inside and outside the Sundarbans along with environmental sustainability. But prior to make a strategic or business plan for CBT development at the surrounding villages, a feasibility study on CBT is mandatory to analyze its different aspects systematically and scientifically.

REFERENCES

Ceballos-Lascurain, H. 1993. 'Ecotourism as a Worldwide Phenomenon', in K. Lindberg, and D.E. Hawkins (eds) *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*, **Volume 1. Natraj Publishers, Dehradun, India.**

Gorica, K. and Paloka, F. 2006. Community-Based Tourism: the case of the Butrint National Park, South Albania. On-line document, Retrieved on April 23, 2010. Web (URL) address: <http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/arhiva/pdf/no19/articol_ fulltext _ page 107.pdf>.

Harris, R. and Vogel, D. Undated. E-commerce for Community-based tourism in developing countries. Star House, Kowloon, Hongkong. On-line document, Retrieved on May 24, 2009. Web (URL) address: <http://rogharris.org/e-CBT.pdf>.

Haider, Md, A. K. 2004. *Sundarban Vhabna.* **Bangladesh Forest Department, Dhaka.**

Iftekhar, M.S. and Islam, M.R. 2004. Managing mangroves in Bangladesh: A strategy analysis. *J. Coast. Conserve*, **10: 139 –146.**

RECOFTC (Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific), 2007. Community-based Tourism for Conservation and Development. On-line document, Retrieved on January 20, 2008. Web (URL) address: <http: // www.recoftc.org / site / index.php?id=355.htm>.

Roe, D. and Khanya, P.U. 2001. Pro-Poor Tourism: Harnessing the World's Largest Industry for the World's Poor. On-line document, Retrieved on August 24, 2006. Web (URL) address: <http://www.iied. Org / pubs / pdf / full / 11007IIED.pdf>.

Salam, M.A.; Lindsay, G.R. and Malcom, C.M. 2000. Eco-tourism to protect the reserve mangrove forest the Sundarbans and its flora and fauna. Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling FK9 4LA, Scotland, U. K. 11(1): 56-66.

Light in a Nutshell

Md. Mahbubur Rahman Khan*

What is Light?

Light is a form of electromagnetic radiation that is visible to the human eye. It consists of particles called photons that travel in waves. Light is characterized by its properties such as intensity, wavelength, frequency, and polarization. It can travel through a vacuum and various mediums, including air, water, and transparent materials like glass. Light plays a fundamental role in many aspects of the universe, including vision, photosynthesis, communication, and the behavior of matter at the atomic and subatomic levels.

What is Lightning?

"Lightning," which is a natural atmospheric electrical discharge that occurs during thunderstorms. Lightning typically happens when electrical imbalances between clouds or between a cloud and the ground are equalized by a sudden flow of electricity. This discharge creates a bright flash of light, which we see as lightning, and generates intense heat and sound waves, resulting in thunder. Lightning can take various forms, including cloud-to-cloud, cloud-to-ground, and intra-cloud discharges, and it can cause damage to property, start fires, and pose risks to humans and animals caught in its path.

Light can be Pollutant?

Most of us are very much familiar with Air pollution, Water pollution, Noise pollution, Soil pollution even odor pollution, but did you know that Light can also be a pollutant?

* Research Officer, Department of Environment

Light pollution refers to the excessive or misdirected artificial light produced by human activities, which brightens the night sky and obscures the natural darkness. It includes various sources such as streetlights, outdoor advertising, industrial facilities, and residential lighting. Light pollution not only interferes with astronomical observations but also disrupts ecosystems, affects wildlife behavior, impairs human health, and wastes energy. It has several negative impacts on the environment, wildlife, human health, and plants.

For billions of years, all life has relied on Earth's predictable rhythm of day and night. It's encoded in the DNA of all plants and animals. Humans have radically disrupted this cycle by lighting up the night.

Plants and animals depend on Earth's daily cycle of light and dark to govern life-sustaining behaviors such as reproduction, nourishment, sleep, and protection from predators.

Scientific evidence suggests that artificial light at night has negative and deadly effects on many creatures, including amphibians, birds, mammals, insects, and plants

Light Sensitive Animal in Nature

Many animals in nature are sensitive to light due to their evolutionary adaptations and specific ecological roles. There are just a few examples below of animals in nature that are sensitive to light in various ways, highlighting the importance of minimizing light pollution to preserve their natural behaviors and habitats:

- **Nocturnal Animals:** Nocturnal animals, such as owls, bats, and some species of rodents, are highly sensitive to light. They have specialized adaptations in their eyes, such as large pupils and enhanced light-gathering abilities, to navigate and hunt in low-light conditions.

- **Marine Creature:** Deep-sea organisms, like certain species of fish and invertebrates, have developed sensitivity to bioluminescence, which is the light produced by other organisms in the ocean. They use this sensitivity for communication, finding mates, and detecting prey or predators in the darkness of the deep sea.

- **Insects:** Many insects are attracted to light sources, a phenomenon known as phototaxis. However, artificial lights can disrupt their natural behaviors and migration patterns. For example, moths are known to be drawn to artificial lights, which can interfere with their navigation and lead to increased predation risk.

- **Sea Turtle:** Sea turtles are sensitive to light pollution, particularly hatchlings. They rely on natural light cues, such as moonlight, to find their way to the ocean after hatching. However, artificial lights from coastal developments can disorient them, causing them to head away from the water and towards danger, such as roads or predators.

- **Birds:** Many bird species are also sensitive to light pollution, especially during migration. Artificial lights can cause birds to become disoriented, collide with buildings or communication towers, and interrupt their migration routes.

Light Sensitive Plants in Nature:

While plants are not typically sensitive to light in the same way that animals are, they do exhibit various responses to light that are crucial for their growth, development, and survival. Here are a few examples of light-sensitive plant behaviors:

- **Phototropism:** Phototropism is the growth of plants in response to light direction. For example, the stems of many plants grow towards a light source, a phenomenon known as positive phototropism, while roots often grow away from light, exhibiting negative phototropism. This allows plants to optimize their exposure to sunlight for photosynthesis and nutrient absorption.

- **Flowering:** The timing of flowering in many plants is influenced by the duration and intensity of light exposure. Plants perceive changes in day length, known as photoperiodism, which triggers flowering in response to specific light conditions. This mechanism is crucial for timing reproductive processes and ensuring successful pollination.

- **Shade Avoidance:** Some plants exhibit shade avoidance responses when they sense competition from neighboring plants for light. They may elongate their stems or alter their leaf orientation to reach or capture more light, maximizing their photosynthetic efficiency.

- **Circadian Rhythms:** Like animals, plants also have internal biological clocks that regulate their physiological processes in response to daily light-dark cycles. Circadian rhythms control various aspects of plant growth, metabolism, and responses to environmental stimuli, helping plants synchronize their activities with the day-night cycle.

- **Photomorphogenesis:** Light also plays a crucial role in regulating plant development and morphology through a process called photomorphogenesis. Different wavelengths of light (red, blue, far-red) are perceived by photoreceptor proteins, such as phytochromes (red/far-red light photoreceptors) and cryptochromes (blue light photoreceptors), which trigger specific growth responses, including seed germination, stem elongation, leaf expansion, and chlorophyll production.

Conclusion

- Addressing light pollution is indeed becoming increasingly important worldwide as artificial light at night continues to grow. It's often overlooked compared to other forms of pollution like air and water pollution, but it can have significant impacts on ecosystems, human health, and astronomical observations.

- It's promising that there's recognition of the need to address light pollution in Bangladesh, especially as it's not currently covered in the Bangladesh Environmental Conservation Act, 1995 and Environmental Conservation Rules, 2023. However, including a provision for light pollution in the amendment of the Bangladesh Environmental Conservation Act would be a positive step forward in raising awareness and addressing this issue.

- Measuring the intensity of light pollution and enforcing laws can be challenging, but it's not impossible. Implementing regulations that set limits on outdoor lighting, promote the use of energy-efficient lighting, and encourage responsible lighting practices can help mitigate light pollution.

- Education and public awareness campaigns can also play a crucial role in reducing light pollution. By informing individuals and organizations about the impacts of excessive artificial light and providing guidance on how to minimize it, communities can work together to protect their environment and preserve the beauty of the night sky.

- Overall, integrating provisions for light pollution into Environmental Conservation Act and Rules are essential for addressing this increasingly significant issue and promoting sustainable development in Bangladesh.

Heat Stress and Dairy Cow Productivity: Challenges and Solutions for High-Yielding Cows

Dr. Md. Rakibul Hassan[1], Eashtiak Ahamed Pehan[2], Sonia Sultana[2] Anowar Hosen[2], Ayesha Shiddikka Afsana[2] and Dr. Nasrin Sultana[3]

Introduction

In order to satisfy the demand for milk and dairy products on a worldwide scale, the dairy sector is crucial. High yielding crossbreeds have become more popular among the many dairy cow breeds, due to their excellent milk production capacities. But it is known that higher-producing cows have a lower tolerance for heat stress (HS) than lower-producing cows and have significant productive, reproductive and physiological effects which may result in a variety of metabolic abnormalities. The estimated yearly milk loss owing to stress among cattle and buffaloes throughout all of Bangladesh is 1.8 million tons, or about 2% of the nation's total milk output. Stress is the body's response to stimuli that disrupt the normal physiological balance or homeostasis and frequently have negative repercussions. Stress results from ongoing environmental pressures on animals that disturb homeostasis and cause new adaptations that may or may not be beneficial to the species. Heat stress is one of the stressors that have been linked to decreased animal productivity in tropical, subtropical, and dry regions.

When determining the amount of thermal comfort or stress felt by animals, especially dairy cows, the Temperature Humidity Index (THI), a composite metric incorporating temperature and humidity, is a crucial factor. When any set of environmental factors causes the effective temperature of the environment to be greater than the animal's "thermo neutral" zone, the animal experiences heat stress.

Dairy cows exposed to high temperatures have an increase in thermoregulatory systems as well as a decrease in metabolism, feed intake, and production. Sweating, rapid breathing, vasodilation, and an increase in blood flow to the skin's surface an animal has to remain in thermal equilibrium with its surroundings, which includes radiation, air temperature, air movement, and humidity, in order to preserve homeothermy. Heat stress alters homeostasis, and its effects have been measured by taking physical measurements including body temperature, pulse rate, respiration rate, and biochemical profiles. There is still little knowledge about the necessary thresholds of these qualities for high yielding crossbred cows, despite the noted and well-known variations in breeds and response to heat stress. In these circumstances, management interventions could be feasible, but they are challenging and expensive to put into practice, especially in cattle that are not well suited.

Traditional practices for mitigating heat stress have been essential in maintaining productivity and animal welfare. These practices include providing shade, increasing water availability, and adjusting feeding times to cooler parts of the day. Additionally, farmers have employed ventilation techniques, such as using fans and sprinklers, to cool down the environment. As climate change

[1] Principal Scientific Officer
[2] Scientific Officer, Dairy Research and Training Center , Bangladesh Livestock Research Institute, Savar , Dhaka - 1341
[3] Director (Research), Bangladesh Livestock Research Institute , Savar , Dhaka – 1341

intensifies, there is a growing need to integrate traditional practices with innovative technologies and management strategies to enhance their efficacy and sustainability in protecting dairy cows from heat stress.

Understanding Heat Stress in Dairy Cows

When the ambient temperature and humidity levels are higher than the cow's capacity to release body heat, heat stress results. The intensity of heat stress is commonly assessed using the Temperature-Humidity Index (THI), where values over 72 signify mild stress and values above 80 signify severe stress. Dairy cows with high yields are especially susceptible to heat stress because of their high levels of metabolic heat generation from digestion and milk synthesis.

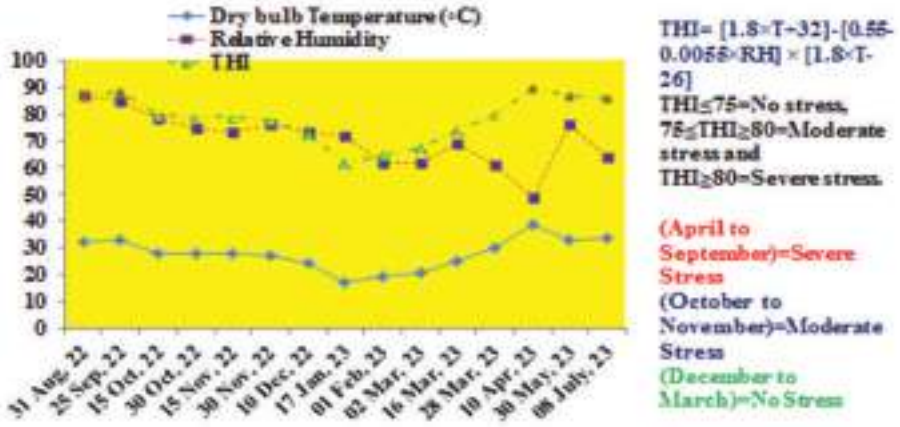

Temperature humidity index (THI) variation in Bangladesh throughout the year

Physiological Effects of Heat Stress

Thermoregulation: Sweating and panting help dairy cows control their body temperature. Panting is the main means of heat dissipation for them since they are unable to sweat as much, which can cause respiratory alkalosis and energy expenditure that reduces milk production. Heat stress causes modifications to the body's metabolism, such as decreased feed intake, changed digestion, and a change in how nutrients are used. Milk production and composition are reduced as a result of these modifications.

Hormonal Imbalances: Heat stress is associated with elevated cortisol levels and lowered thyroid and insulin levels. The immune system is suppressed, feed efficiency is decreased, and milk production is hampered by these hormonal changes.

Blood Flow Redistribution: Blood is redirected from the internal organs to the skin to facilitate heat loss, which can reduce nutrient absorption and gastrointestinal motility, further impacting milk production.

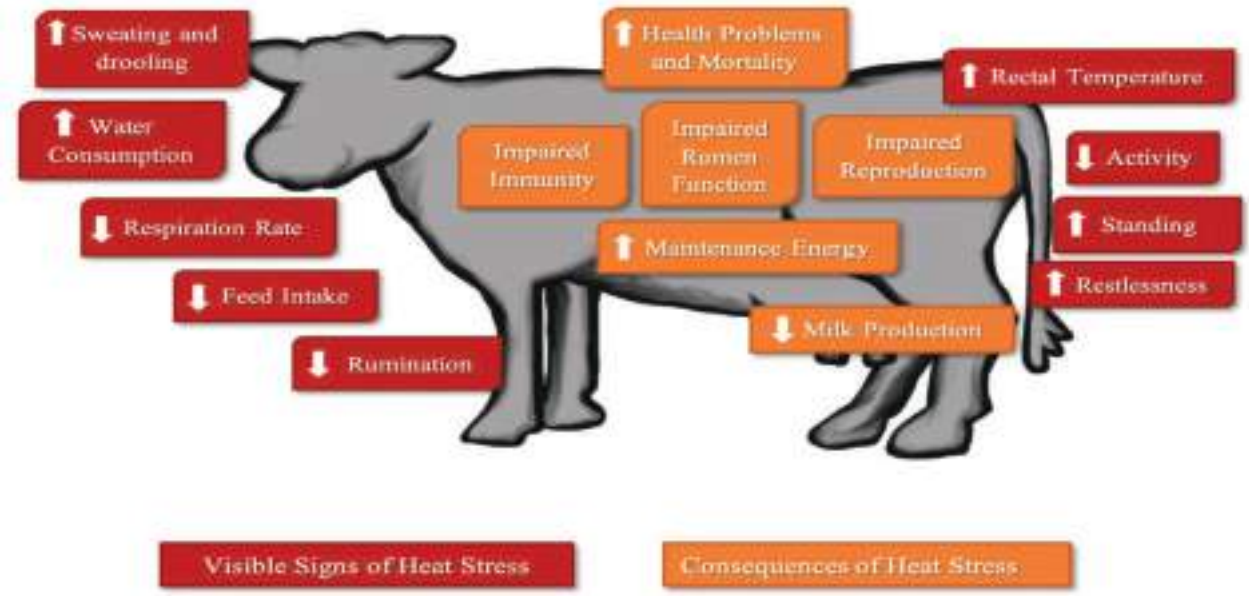

Behavioral Changes

Reduced Feed Intake: To minimize metabolic heat production, cows reduce their feed intake, which directly impacts milk yield and quality.

Increased Water Intake: Cows increase their water intake to compensate for water loss through sweating and respiration, but if water availability is limited, it can lead to dehydration and further reduce productivity.

Seek Shade and Reduced Activity: Cows often seek shade and reduce their activity levels to cope with high temperatures, impacting grazing behavior and milk yield.

Impact of Heat Stress on Productivity Milk Yield and Composition

Reduced Milk Yield: High temperatures lead to a significant drop in milk production. Studies indicate that milk yield can decrease by 10-25% during periods of severe heat stress.

Altered Milk Composition: Heat stress affects milk composition by reducing fat, protein, and lactose content, which impacts milk quality and the overall value of dairy products.

Reproductive Performance

Lower Fertility Rates: Heat stress affects reproductive hormones, leading to irregular estrous cycles, lower conception rates, and increased embryonic mortality.

Longer Calving Intervals: The combined effects of reduced fertility and higher embryonic losses result in longer calving intervals, affecting herd productivity.

Health Issues

Increased Disease Incidence: Heat stress compromises the immune system, making cows more susceptible to diseases such as mastitis, respiratory infections, and metabolic disorders.

Higher Mortality Rates: Severe heat stress can lead to heat stroke and increased mortality, especially in high-yielding cows that are more prone to heat-related health issues.

Ec**onomic Impact**

The economic impact of heat stress on dairy farms is substantial. Reduced milk production, lower reproductive efficiency, increased veterinary costs, and higher mortality rates all contribute to significant financial losses. The dairy industry faces billions of dollars in losses annually due to heat stress.

Mitigation Strategies

Mitigating the effects of heat stress involves a multifaceted approach that includes environmental modifications, nutritional adjustments, genetic selection, and advanced management practices. The goal is to enhance the cows' ability to cope with heat stress and maintain productivity.

Environmental Modifications

Shade and Shelter: Providing adequate shade is crucial. Trees, shade cloths, and constructed shelters can protect cows from direct sunlight. Barns should be designed or modified to include open sides, ridge vents, and light-colored roofing materials to reduce heat accumulation.

Ventilation: Improving airflow in barns and holding areas is essential. High-volume, low-speed fans can provide consistent air movement, while ventilation systems should be designed to maximize cooling efficiency.

Cooling Systems: Using sprinklers and misters in combination with fans can enhance evaporative cooling. Sprinklers should be used intermittently to wet the cows' skin, followed by fans to promote evaporation and cooling.

Cooling Pads: In high-density dairy operations, cooling pads can be installed in feed bunks and resting areas to provide additional cooling.

Nutritional Management

Feed Adjustments: Providing highly digestible feeds can reduce metabolic heat production. Rations should be adjusted to include more energy-dense components, such as fats, which produce less heat during digestion compared to carbohydrates.

Electrolyte Supplementation: Adding electrolytes to the diet can help maintain hydration and electrolyte balance, which are critical during periods of high heat stress.

Feeding Schedule: Adjusting feeding times to cooler parts of the day, such as early morning or late evening, can encourage better feed intake and reduce the metabolic heat load.

Genetic and Breeding Strategies

Heat-Tolerant Breeds: Incorporating heat-tolerant breeds, such as Jersey or certain Bos indicus crosses, can improve resilience to heat stress. These breeds have physiological traits that enhance heat dissipation.

Genomic Selection: Advances in genomic technologies enable the identification of genetic markers associated with heat tolerance. Breeding programs can incorporate these markers to develop more heat-resistant dairy cows.

Crossbreeding: Crossbreeding high-yielding dairy cows with heat-tolerant breeds can combine high milk production traits with enhanced heat tolerance.

Management Practices

Heat Stress Monitoring: Regularly monitoring environmental conditions and cow behavior is crucial. Using THI calculators and observing signs of heat stress can help farmers implement timely interventions.

Cow Comfort: Enhancing cow comfort through proper bedding management and minimizing handling during hot periods can reduce stress and improve overall well-being.

Strategic Scheduling: Adjusting management routines, such as feeding, milking, and veterinary treatments, to cooler parts of the day can help mitigate the effects of heat stress.

Technological Innovations

Precision Farming Tools: Wearable sensors and monitoring systems can provide real-time data on cow health and behavior. These tools can alert farmers to early signs of heat stress, enabling prompt action.

Automated Cooling Systems: Automated cooling systems equipped with sensors and timers can optimize cooling interventions based on real-time environmental data, ensuring consistent and efficient cooling.

Conclusion

Heat stress poses a significant challenge to the productivity and health of high-yielding dairy cows. Understanding the physiological and behavioral effects of heat stress is crucial for developing effective mitigation strategies. By implementing a combination of environmental modifications, nutritional adjustments, genetic selection, and advanced management practices, dairy farmers can significantly reduce the impact of heat stress on their herds. Proactive management and continuous adaptation to changing environmental conditions are essential in maintaining the health and productivity of high-yielding dairy cows in a warming world. The adoption of innovative technologies and data-driven approaches will further enhance the resilience of dairy operations against the challenges posed by heat stress.

Perspectives of Land restoration, desertification and drought resilience: Lesson Learns and What to do?

Maimuna Qazi*
Mohammad Alamgir**

Land is a resource that supports our lives through bearing nutritious crops that feed us, on which building structures are built wherein we cozily live in, cultivates trees that filter air and produce oxygen for us, and where all living creatures will eventually decompose into. It is a complex system. Land consists of soil that anchors roots, holds water, and stores nutrients. It functions are diverse and complicated, and our lives depend on it directly and indirectly.

Despite the precious value of land as a resource, its care is often overlooked as we mercilessly exploit it. Our lands have borne the brunt of careless pollution, land occupation by real-estate developers, deforestation to feed the ever-growing populace, urban garbage dumping and needless to mention, strengthening natural climate disasters. Impacts of these are dreaded and faced by all sectors- agricultural, industrial, commercial and municipal sectors, energy, recreation and environment. But we cannot do with complaining. Understanding the problem firsthand and actively taking up measures to fight it, is imperative to restore land, prevent desertification and bring about drought resilience. It is important to acknowledge the current deficiencies in land management and take up efforts to curtail such practices that lead to its degradation and to restore its functional value.

Land, in itself is a tangible property, however, its use and practices that lead to significant detrimental consequences – seem to make it appear as an intangible resource. Land has been voraciously exploited for agricultural lands and industrial development. Although land will last forever, its innate value to bear plants, i.e. agricultural land productivity, is largely affected by the misuse of land. Natural land degradation has been exacerbated by human intervention such as deforestation, industrial activities, overgrazing, soil contamination (industrial, domestic and hospital wastes) and urbanization, thus endangering land fertility and productivity over time. This puts global food security, ecosystem health and sustainable development at stake and slows down natural ways of reclamation. Preventing the permanent impacts of soil degradation is crucial through the implementation of sustainable land management techniques. Land restoration activities such as conservation agriculture, precision fertilization, afforestation, and pollution control measures must be initiated to restore soil health.

One of the most significant sources of water supply, groundwater, has seen a significant decline in quantity and quality over the past decades as a result of extraction beyond specified safe limits1. Over-extraction of groundwater prevents its natural recharge and that results in a number of negative effects, including soil salinity, land subsidence, a decrease in the river waterflow and rivers drying up, groundwater salinity intrusion, secondary salinity and, the establishment and spread of desert regions1. Land degradation and drought go hand in hand. Creation of arid, xeric landscapes endangers human life and contributes to the depletion of natural resources leading

* Scientific Officer, Water Resources Planning Organization (WARPO), WARPO Bhaban, 72 Green Road, Dhaka-1215

** Principal Scientific Officer, Water Resources Planning Organization (WARPO), WARPO Bhaban, 72 Green Road, Dhaka-1215

to desertification. It is important to understand the impact of desertification and drought before resorting to means to restore it.

Climate-related disasters have seen an egregious 83 percent rise over the past two decades2. Increased drought events, reduced/untimely rainfall, decreasing water tables have led concomitantly to desertification and degradation of soil, i.e. land quality. However, the intensive nature of droughts are often simply considered as periods of low water availablity. Repeated such events have caused desertification to spread largely over once-cultivable lands and will eventually lead to more demand and competitive use of water. Moreover, drought events are unpredictable. It is important to develop tactical knowledge in preparation of uncertain events such as these. Consistent drought patterns can pressurize and cause disruption in the balances of power in water use consumption competitiveness. Drought and its implications need to be clearly manifested by the general populace into convincing and adopting water management options that were not gravely considered in the past and current years. Commercial agriculture is heavily dependent on groundwater and alternative solutions are a dire need.

Bangladesh has been on a vulnerable spot, hit by weather extreme events such as drought, salinity, secondary salinity, etc. Notable ones include drought events in 1951, 1957, 1961, 1966, 1972, 19893 and such episodes have intensified over the past years causing agricultural losses. Other important land related catastrophes include saline intrusion, land subsidence (subsidence rates of 6mm/year in south-west coastal belts have been reported4). Climate-change mediated water scarcity can initiate desertification with its over-reaching long-term impacts on land and soil quality (structure and its organic matter composition) and water storage levels and even fisheries and aquatic resources (some species are directly related to water levels). Consequently, these directly have an impact on freshwater avalability as sources are parched and drought events are intensified coupled with incidence of floods due to inadequate drainage.

Plants are guardians of land- they combat desertification by preventing soil erosion. Plants have multifarious functions – they cover the soil surface and prevent its loss by wind and water flows through their deep extensive root systems; they provide shade, minimizing evaporation, and weathered fallen leaves churn into organic fertilizer eventually becoming a topsoil cover that preserves soil moisture. Increased soil fertility and moisture help to prevent desertification. Shrubs and bushes have shallow root systems that expand underneath the soil surface to ensure easy access to surface moisture. Cutting natural trees for agricultural expansion and soil compaction from building structures are major contributors to plant loss and ultimately, desertification. Therefore, appropriate management solutions and techniques are crucial to prevent the grave consequences of this phenomenon. We must develop a system that can withstand severe droughts and reverse desertification through afforestation even in the face of a booming demography and a fixed, declining water supply. An innovative idea would be a shift in the agricultural- as well as cultural mindset by adopting drought resilient crops such as pearl millet for as a substitute for rice, maize or wheat as staple crops. Pearl millet is a climate-smart vegetative, that tolerates stress (drought, high temperature, nutrient-poor) and has a high biomass production potential; thus is a suitable choice of cereal for cultivation under harsh conditions such as droughts. Large scale cultivation of millets can reduce the competition for water usage in agriculture.

With current scenario of land degradation, every individual at administrative, industrial, and individual level need to tighten their waist belts and delve into mitigation measures that can reclaim soil, prevent further degradation, reverse desertification and develop drought resilience. Drought and water mangement are intricately interwined.

To reach the outcome of land restoration, some course of actions must be taken up – early response to drought/desertification, proper time-based tactical measures, media interface, new policy adoption and maintenance of proper existing rules. Roles should be divided upon mass media as well, who should responsibly delineate the message precisely designed by policymakers. Sophisticated strategic planning is required for crisis management such that land degradation does not become worse and drought impact complexities can be minimized. The following recommendations may serve as a guideline.

- Educational campaigns for the public as well as stakeholders in water consumptive use would ensure effectiveness of conservation programs.
- Innovative agricultural practices such as mulching and conservation tillage allow for cutbacks in water usage. Proper land management techniques and water conveyance systems must be ensured.
- Groundwater replenishment activities by preventing excess withdrawals. Utilizing climate-change phenomenon such as heavy rains though nation-wide rain water harvesting should be set up for alleviating water shortages.

Effective measures such as monitoring number of groundwater wells and, setting land use regulations for groundwater protection zones, monitoring well drilling permits and allowing licenses only upon investigation and ensuring water levels are not endangered are necessary.

- Hydrogeological research to investigate groundwater basins while keeping accounts of usable reservoir storage, recharge areas, water quality problems can help maintain groundwater recharge and conjunctive use of surface and groundwater.

Monitoring drought and land quality on a regular basis through database management and observation of disaster trends would facilitate and official drought contingency plan activation.

- Establishing a nation drought emergency water bank (such as those in California, USA)5 can meet critical water needs.

Water transfer among agricultural users can be facilitated establishing drought action fund to assist conservation.

- Xeriscaping practices should be adopted that involve slow-growing, drought tolerant plants to conserve water and reduction of yard trimmings. Added to that, a landscape can be designed to reduce the amount of resources needed to maintain it and the amount of waste it produces.

Conjunctive use rice lands/wetlands can be advantageous- in addition to sustaining communities and economies dependent on rice cultivation, flooded rice paddies can provide off-stream storage capacity, promote aquatic biodegradation of rice stubble (instead of burning them on the field and creating air pollution).

Land fallowing can be instrumental to maximize soil water storage via improved water intake and reduced decreased evaporation.

- Urban households need to adopt water-conserving lifestyles.
- Policy dialogoues and discussions must be set up between agricultural, urban and envrironmental groups such that each group underestands the others' water needs and together develop solutions to address needs of each respective sector.

These protective measures and perspectives to restore land reflect the thinking of policy makers and require quick action. Significant amounts of research should be devoted to study and fish out new initiatives. Significant changes in the country laws that devote to land protection is necessary.

Legislation that guides managers of the water sector to navigate through the institutional water control framework are necessary.

Land and water usage are essential and cannot be stopped. Desertification and drought are interconnected as land and water are inseparable systems that cannot sustain without each other. In the interim, better management of land and water must be sought after in the face of a burgeoning population and dwindling agricultural lands. Developing awareness among current generations to protect the very soil that sustains humankind is of vital importance. It is crucial to take up practical, long-lasting changes by the current #GenerationRestoration that will serve as explicit lessons for the generations to come.

References:

1. Saleh, Iman & Khazaei, Majid & Naeimi, Maryam & and Soil Management and Modeling, Water. (2023). Desertification intensity affected by groundwater and land subsidence in Maharloo-Bakhtegan watershed. 3. 171-184. Doi: 10.22098/mmws.2022.11906.1187.

2. Yale Environment 360, E360 Digest, October 13, 2020; https://e360.yale.edu/digest/extreme-weather-events-have-increased-significantly-in-the-last-20-years

3. Droughts and Integrated water resource management in South Asia, Jasveen Jairath and Vishwa Ballabh

4. Meem, Mahnaz & Islam, M & Debnath, Premanondo. (2016). Subsidence in the Coastal Belt of Bangladesh and its Implication to Coastal Dynamics and Ecosystem.

5. Executive summary of the lessons learned from the California drought (1987-1992; IWR report 94- NDS-6, oct 1994, US Army corps of engineers)

A Vision for Environmental Justice and Sustainability

Poribeshbid Sk. Abu Jahid*

Environmental justice envisions a safe place for everyone, regardless of geographic location, income, color or ethnicity, has equal access to environmental benefits and protection from environmental threats. According to the US Environmental Protection Agency (EPA) [1], environmental justice is "*the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income, with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies.*" In an effort to ensure a fair and sustainable future for all, this vision calls for structural adjustments that address the ingrained injustices that contribute to environmental imbalances.

The primary demand for environmental justice is to *distribute resources fairly* is essential to building a just and equitable society. It guarantees that clean air, clean water, and green areas benefit all communities for the purpose of healthy future. Besides, policies and strategies that support resource equity give underrepresented groups priority and deal with past injustices. Apart from this advocating for their equitable share of resources is made possible by transparent governance systems and participatory decision-making processes within communities. Governments, organizations, and communities should work collectively to ensure effective and efficient management and distribution of all sorts of resources. Societies may build a more sustainable world where resources are distributed fairly and everyone's well-being is enhanced by sustaining the values of justice and solidarity.

Fair burden sharing ensures that no group faces difficulties or sufferings disproportionately in a just society. Equitable distribution of environmental, social, and economic obligations exists; richer and more resourceful societies provide more to help those in need. Policies are made to ensure that those who are most susceptible to health crises, economic downturns, or pollution don't suffer the most. When tackling issues like resource scarcity, social injustice, and climate change, group initiatives make guarantee that everyone participates in and gains from the solutions. The promotion of empathy and solidarity among society's members guarantees that responsibilities are shared, resulting in a more equitable and welcoming global community.

The "*polluter pays principle*[2] " idea makes sure that those who harm the environment are held financially accountable for their activities in a just society. By internalizing the costs of pollution, this theory encourages companies and individuals to adopt cleaner, more sustainable behaviors. Regulations punish polluters with fines and penalties and allocate money for public health and environmental rehabilitation projects. The money made helps fund the advancement of environmentally friendly technologies as well as the reconstruction of impacted areas. This accountability encourages corporate responsibility and lessens environmental deterioration. By holding polluters accountable, society discourages destructive behavior and promotes sustainability and stewardship, safeguarding the environment for next generations.

Knowledge based society provides people the strength to decide for themselves and their communities, enabling them to take meaningful action and make educated decisions. Having access

* Director, Admin and Finance, Bangladesh Poribeshbid Society

1 https://detroitenvironmentaljustice.org/what-is-environmental-justice/

2 https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polluter-pays-principle#definition

to knowledge and education promotes creativity, critical thinking, and problem-solving abilities. It generally makes it possible for people to be aware of their rights, speak up for themselves, and take part in community activities. By improving productivity and skills, knowledge promotes economic growth and leads to greater work prospects and a higher standard of living. In terms of environment, communities with a greater understanding of the environment are better prepared to embrace sustainable practices and support laws that safeguard natural resources. In the end, knowledge is a catalyst for advancement in society, personal development, and the creation of a more just and sustainable world.

Prevention is the most crucial tool for ensuring the sustainable environment in all spheres of the society. Besides, societies may save a great deal of money and suffering by dealing with problems before they become more serious. Likewise, environmental conservation initiatives, such pollution control and forest preservation, stop the loss of biodiversity and lessen the effects of climate change. Apart from this, proactive steps in public safety, such as infrastructure upkeep and early warning systems, lower the likelihood of mishaps and natural disasters. People are empowered to make safer and healthier decisions via education and awareness initiatives. By following these pathways, communities can build robust systems that endure difficulties and guarantee long-term prosperity and well-being by placing a high priority on prevention.

Science acts as a compass for us, providing direction through reasoned inquiry and knowledge based on facts. It opens our eyes to the intricacies of the natural world, revealing the workings underlying occurrences and creating new avenues for exploration. Also, science offers answers to problems ranging from technology and health to environmental sustainability and beyond via observation, investigation, and analysis. It encourages creativity, propelling advancement and influencing societal development. The integrity and dependability of scientific discoveries are guaranteed by adherence to the standards of objectivity and peer review. With the help of scientific consensus, policymakers may create evidence-based policies to solve urgent problems and enhance the welfare of the general population. Adopting scientific literacy enables people to interact critically with their environment and make educated judgments. In the end, science points the way toward a future that is more equal, sustainable, and enlightened.

Innovation of technologies and approaches can assist to counteract environmental inequalities, guaranteeing equitable allocation of resources and prospects. Partnerships between communities, legislators, and entrepreneurs promote inclusive responses to environmental problems that give underprivileged groups' concerns first priority. Real-time monitoring of environmental risks is made possible by technological breakthroughs, which allow communities to speak out for their rights and general well-being. In addition, a bunch of initiatives which are focused on social innovation encourage community-led solutions and participatory decision-making, which in turn drives systemic change. Disparities in environmental quality can be decreased not only by equitable access to clean resources provided by green technology, but also advancements in renewable energy. Additionally, creative finance strategies encourage investments in marginalized areas, fostering environmental resilience and economic development. Hence, innovation is a potent reagent for revolutionary change that advances environmental justice and builds a more just and sustainable future for all.

Indigenous knowledge honors the complex relationships that exist between people, the natural world, and spirits. It is based on millennia of lived experience. As a result, Indigenous tribes have a profound understanding of the ecosystems in their area and use tried-and-true methods to adapt to changes in the environment. Besides, Traditional ecological knowledge emphasizes harmony and reciprocity with the earth, which serves as a guide for the care of natural resources. Moreover, cultural customs and rituals can strengthen the spiritual bond with the natural world, encouraging respect and conservation efforts. Furthermore, community-led conservation programs protect biodiversity and ancestral areas while giving priority to indigenous sovereignty and rights. Thus, appreciating and acknowledging indigenous knowledge is crucial to accomplishing fair and sustainable environmental protection on a global scale.

Economic expansion and environmental protection are balanced in a world where sustainability drives progress so as to fulfill current demands without jeopardizing the well-being of future generations. In order to minimize their negative effects on the environment, development projects target waste minimization, resource efficiency, and renewable energy. Sustainable techniques in industry, agriculture, and urban design guarantee the preservation of ecosystems and the protection of biodiversity. Policies and rules encourage companies to use sustainable business models by supporting green technology and developments. Furthermore, natural catastrophe susceptibility is decreased by the climate change resilient infrastructure. In order to ensure that all communities have access to clean water, air, and natural resources, social equality is essential to sustainability. By promoting sectors that support the concept of circular economy and generating green jobs, sustainable development helps to stabilize the economy. In this perspective, sustainability serves as the cornerstone of all advancement rather than an afterthought, pointing mankind toward the goal of a peaceful and prosperous future that benefits both people and the environment.

Justice is a universal concept that acknowledges the intrinsic worth and entitlements of every person, irrespective of their citizenship or place of birth. It includes values that transcend geographical borders, such as justice, equality, and accountability. To confront common difficulties, foster mutual respect, and defend justice on a global scale, international collaboration and solidarity are vital. Consequently, environmental injustice should be addressed through cross-border cooperation and collective action. So, it can be articulate that environmental justice acts as a uniting factor in a linked world, bridging gaps to create a more just and peaceful society for all.

Since environmental justice deals with the fair distribution of environmental advantages and liabilities, it is important not only for Bangladesh but for all countries in the world. Environmental justice is crucial to guaranteeing that disadvantaged groups in Bangladesh, a nation facing several environmental difficulties including deforestation, air and water pollution, and the effects of climate change, have access to clean water and healthy living conditions. Furthermore, via reducing climate change, protecting biodiversity, and advancing sustainable development strategies, environmental justice initiatives in Bangladesh support environmental sustainability on a worldwide scale. Given the interdependence of environmental concerns, tackling transboundary environmental difficulties and guaranteeing that everyone, regardless of origin or background, may enjoy a healthy and sustainable environment depend on international collaboration and solidarity. Bangladesh and the international community may work toward a more just and sustainable future for all by placing a high priority on environmental justice.

Plastic Pollution's Persistent Threat to the Environment: A Silent Crisis

Istiak Ahmed*

The use of plastics has grown ubiquitous. On an hourly basis, the globe consumes one billion plastic bags and buys one million plastic bottles. Both individuals and businesses are drawn to plastics due to their low cost, durability, light weight, and ease of processing.

A silent but deadly danger, plastic pollution, is slowly but surely making its way into our ecosystems, right alongside our contemporary conveniences. An environmental enemy now swarm across land, sea, and even the air we breathe, having evolved from something that appeared to be helpful to our everyday existence. This situation demands careful consideration, an acknowledgment of how big the problem is, and a concerted attempt to handle it in a responsible manner because of how urgent it is.

Imagine a peaceful beach at dawn, with the sound of the waves gently caressing the coast like a lullaby. However, if you examine the seaweed and shells more closely, you might notice an unwanted visitor among them. The disturbing sight of plastic bags, bottles, and shards littering the shoreline is hard to ignore. The pervasiveness of plastic garbage is the larger problem that this picture captures. Although it meets our immediate needs, our culture's emphasis on convenience has unintentionally contributed to environmental degradation.

A new sneaky invader of our ecosystems is microplastics, tiny particles made from the decomposition of bigger plastic products. These minute, almost undetectable particles end up in every part of our environment, whether it's the air, water, or soil. There will be far-reaching effects. Microplastics cause a domino effect in the food chain when marine life unknowingly eats them. The delicate equilibrium of aquatic habitats is greatly threatened by this subtle contamination.

Our once-beautiful oceans now show the marks of our reliance on plastic. A new study found that the world's oceans are contaminated with a "plastic haze" consisting of an estimated 171 trillion pieces of plastic, which, if collected, would weigh almost 2.3 million tons. The effects of human-caused plastic pollution are felt by all sizes of marine life. Some of the costs of our convenience-driven way of life include becoming entangled in abandoned fishing gear, swallowing plastic particles, and upsetting natural habitats. Thread by synthetic thread, the aquatic world—a fragile web of life—is being unraveled.

But the problem isn't limited to the shore; it permeates every aspect of our life. Overflowing landfills with trash serve as a stark reminder of how much we value efficiency and economy over quantity. The resilience of plastic, which is great when used as intended, becomes a problem when it ends up in these huge landfills. Over the course of hundreds of years, plastics decompose, releasing toxic compounds into the soil that could end up in food chains and endangering ecosystems.

Even in the most vibrant and forward-thinking urban centers, plastic pollution is slowly making its way into the water supply. The role of stormwater runoff in transporting plastic trash to rivers

*Institute of Marine Sciences, University of Chittagong

and, ultimately, seas is frequently disregarded when discussing comprehensive urban planning strategies. A secret channel for pollutants, it serves as a stark reminder that our choices have far-reaching implications, even in the middle of urban landscapes.

Even when things are looking bleak, there remains hope for the future. A growing number of environmental efforts and grassroot groups are drawing attention to the problems caused by plastic pollution. People are getting together in communities to demand that people cut down on their use of plastic and start living more sustainably. More and more people are calling for appropriate laws and programs to reduce plastic consumption, demonstrating the strength of collective action.

The issue's criticality is being acknowledged by both governments and industries. We should move in the right way by enacting laws that prohibit single-use plastics, funding recycling infrastructure, and studying alternative materials. Recognizing the practicality of plastics while also looking for ways to lessen their influence on the environment is a fine balancing act.

Finally, it is important to recognize that plastic pollution is a serious issue. This crisis is subtle and affects us in ways that we may not always be aware of. Everyone from individuals to communities to businesses to governments has a hand in fixing this problem. We can all do our part to stop plastic pollution by being more aware consumers, lending our support to sustainable initiatives, and speaking up for ethical business practices. It's not an easy task, and we need to tackle it with finesse, dedication to change, and the knowledge that our personal health is correlated to the state of our surroundings.

Land Degradation and Desertification in Bangladesh; Causes and Sustainable Solutions

Jannatuj Jeba Tamanna*
Md. Alim Miah**

Introduction

Land degradation is the consequence of multiple processes that both directly and indirectly reduce the utility of land. According to FAO, land degradation is a "process which lowers the current and/or potential capability of soil to produce goods and services". According to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD, 1994), "land degradation is the loss or reduction of the biological as well as economic productivity and complexity of irrigated or rainfed cropland, or pasture, range, woodlands, and forests that results from the land uses or from a single or combined processes, including those arising from human activities."

Land is a crucial resource that supports food production, preserves biodiversity, aids in the natural regulation of water systems, and serves as a carbon reservoir. Nowadays, land degradation is prevalent in worldwide, resulting from physical, chemical, and biological changes driven by environmental, social, and economic pressures. Today, more than two billion hectares of previously productive land is degraded globally Over 70% of natural global ecosystems have been transformed. By 2050, this could hit 90 %

Desertification is the long-term result of the interaction of different land degradation processes, which can be accelerated under severe drought conditions; although it can occur under very diverse climatic conditions. Agronomists classify soils with less than 1.7% organic matter as being in a pre-desertification stage. The UNEP and the FAO have defined desertification as the land degradation in arid, semi-arid, and sub-humid areas due to anthropogenic activities.

Land degradation and desertification are both considered natural and human induced problems, that are largely, but not exclusively, driven by demand side causes. The terms 'land degradation' and 'desertification' are often used interchangeably in drylands. Land degradation and ongoing desertification can be limited, reversed and avoided through the appropriate management of land. It is, therefore, highly varied in its nature and consequent impacts.

Bangladesh Perspective

Bangladesh is also facing the menaces of land degradation like other countries. Although the country receives a high amount of rainfall every year, the northern part is being threatened by desertification. Bangladesh has faced drought 19 times between the period of 1960 and 1991, and these droughts affected nearly 47% of the total country (DoE, 2005).

Low soil fertility in drier areas of Bangladesh has been recognized as being the root cause of desertification. In the west-northwest of the country, total precipitation in the region is considered

* Undergraduate Student, Department of Environmental Science & Engineering, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal-2224, Mymensingh.
** Assistant Professor, Department of Environmental Science & Engineering, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal-2224, Mymensingh.

as the dry region. In drier parts of Bangladesh, low soil fertility is recognized to be at the root of land degradation leading to desertification. The western-northwestern part of the country is considered as vulnerable to desertification. These vulnerable areas include the greater districts of Rajshahi, Kushtia, northwestern Jessore, Pabna, western Bogora and southern Dinajpur.

Bangladesh is the largest delta on earth created by alluvial deposits of the world's three large rivers the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna. Despite receiving high total rainfall, the country is threatened by desertification. The process of desertification has been evident in different regions. In Bangladesh, the islands of the Lalmai, Madhupur and Barind tracts are considered as the Pleistocene Terraces. It is a highly desertification area. In Madhupur tract, nearly 12,505 km2 areas are affected by over exploitation of vegetation resources and overgrazing and in Barind tract, about 1,267 km2 are degraded by improper utilization of lands.

Causes of land degradation and desertification in Bangladesh

Bangladesh is not a desert, but overexploitation of its natural resources has gradually been converting this beautiful green land into an arid and environmentally catastrophic country. About 6.0 M ha, or 43.0 percent of the total geographical area is affected by various forms and degree of degradation. The causes of land degradation and desertification are same as elsewhere in the world. The natural factors that contribute to desertification; Changes in temperature and precipitation patterns, drought and soil erosion. Except natural causes, much of the land degradation is caused by population growth, deforestation, land use change and human induced technological change in agriculture. Population growth has increased food demand, rural poverty and landlessness, and required over-exploitation of land, water and forest resources that caused land-use/land-cover changes, deforestation, soil erosion, depletion of ground water, land and water pollution, and loss of crop yield in land stressed countries. The restriction of fresh water flows is another cause of desertification in Bangladesh. The diversion of Ganges water by the Farakka barrage in India has contributed to the reduction of surface water availability and aggravated the desertification process in the western part of the country. The Teesta River is also drying up during the dry season due to the absence of the Teesta Agreement. These are also causes of desertification.

Sustainable Solutions to combat desertification in Bangladesh

Solutions to combat desertification lie in controlling the causes of desertification. A cause-treatment approach is the way to counter the degradation processes and to ensure sustainability. Some sustainable solutions to combat desertification in Bangladesh;

Reforestation and afforestation: Planting trees can help to restore degraded land and improve soil quality. Afforestation, the establishment of forests in areas where there were no trees before, can help to mitigate the effects of desertification by reducing erosion and increasing soil fertility.

Water conservation and management: Effective water conservation and management practices can reduce water scarcity and improve soil moisture, which is crucial for plant growth. Strategies such as rainwater harvesting, drip irrigation, and drought-resistant crops can help conserve water and improve crop yields.

Sustainable land management: Sustainable land-management practices, such as agroforestry, sustainable grazing, and conservation agriculture, can help to improve soil quality, reduce erosion, and increase biodiversity. These practices can also provide economic benefits to local communities by improving agricultural productivity and creating new income-generating opportunities.

Landscape restoration: Landscape restoration involves restoring entire ecosystems, such as watersheds or river basins, to promote ecological resilience and improve environmental conditions.

Soil restoration techniques: Soil restoration techniques aim to improve soil fertility and quality in degraded areas. Some examples of soil restoration techniques include: Addition of organic matter, Use of fertilizers, Soil amendments etc.

Policy Solution: Policy solutions at the international and national levels are important for promoting sustainable land-use practices and combating desertification. Effective policies and programs can help address the underlying causes of desertification, such as unsustainable land-use practices and deforestation, and promote the sustainable use of natural resources.

Conclusion

Land degradation and desertification are critical environmental challenges in Bangladesh, affecting a significant portion of the country's geographical area. These processes threaten the sustainability of agriculture, biodiversity, and overall ecosystem health. Approximately 43% of Bangladesh's land area is experiencing various degrees and types of degradation. The primary driver of desertification is low soil fertility, particularly in the drier regions of the country. The west-northwest regions, known for their arid conditions due to low precipitation, are most severely affected. It is clear that our country is going through the overall process of desertification. To combat land degradation and desertification, various sustainable solutions are being implemented and recommended. As well as the government have duty to take effective initiatives subject to close observation of the matter.

References

1. M. Robiul Islam, Weijuan Zhang, Sishuai Mao, A. Egrinya Eneji and Yuegao Hu; Status of Land Degradation and Desertification in Bangladesh and the Role of Agro forestry in their Control; Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology, 3(2), 107-116, 2010, ISSN: 2006-3938

2. National Report on Implementation of United Nations to Combat Desertification; Government of the Peoples Republic Bangladesh; Ministry of Forest and Environment; https://www.unccd.int/sites/default/files/prais-legacy/Bangladesh/2001/Bangladesh%20-%20ACP%20-%202001%20eng.pdf

3. Katyal, Jagdish C.; Vlek, Paul L. G.; Desertification: Concept, causes and amelioration; ZEF – Discussion Papers on Development Policy Bonn, October 2000; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/84771/1/zef_dp33.pdf

4. Catherine Bowyer, Sirini Withana, Ian Fenn, Samuela Bassi; Land Degradation and Desertification; European Parliament; IP/A/ENVI/ST/2008-23; https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/416203/IPOL-ENVI_ET(2009)416203_EN.pdf

চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় গ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ আনিশা সান্তনির আঁকা চিত্র।

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্টল পরিদর্শন

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্টল পরিদর্শন

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহোদয়ের স্টল পরিদর্শন

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- বক্তৃতা করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী

COP 28 তে- বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী কেনিয়ার নাইরোবিতে ৬ষ্ঠ জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে 'এনসিউরিং পাবিলক এন্ড প্রাইভেট ফিনান্সিয়াল ফ্লোজ এলাইন্ড উইথ এনভায়রনমেন্টাল গোলস টু ক্লোজ দ্য ম্যাসিভ ফান্ডিং' শীর্ষক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন (শুক্রবার, ১ মার্চ ২০২৪)। পিআইডি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্মার্ট মন্ত্রণালয় বিনির্মাণে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন (সোমবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪)। -পিআইডি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বন ভবনে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।-পিআইডি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে বক্তৃতা করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী

শব্দদূষণ বিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও শব্দদূষণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

NAP EXPO 2024 BANGLADESH তে- বক্তৃতা করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষে ১১তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বির্তক প্রতিযোগিতা ২০২৪ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৭ মার্চ শুভ জন্মদিন উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

শব্দদূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনার লক্ষ্যে র‍্যালীতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ

পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিবেশ অধিদপ্তরের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

পরিবেশ বির্তক প্রতিযোগিতা ২০২৪ (চূড়ান্ত)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন জনাব জীবানন্দ রায়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লি.

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন ড. এস এম মফিজুল ইসলাম

পরিবেশ অধিদপ্তরের এরিয়াল ভিউ